ওঁ

# হিন্দু, হুঁসিয়ার !

৭ম সংস্করণ

প্রবন্ধমালা ঃ—

(১) ভারতে খৃষ্টান মিশনারী
(২) মিশনারীদের প্রয়োজন কোথায় ? ভারতে ? না তাঁহাদের নিজদেশে ?
(৩) ধর্ম্মান্তর কর্ম্মে মুসলিম মিশন
(৪) বিভেদ কি শুধু হিন্দু সমাজেই ? অন্যদের সমাজে নাই ?
(৫) হিন্দুধর্ম্মের প্রচারশীলতা ঃ আমাদের কর্ত্তব্য !

স্বামী নির্ম্মলানন্দ

# যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর মহাজীবনের উপর রচিত গ্রন্থাবলী

- **শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য-জীবন-চরিত** :—যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের তপঃসিদ্ধ মহাজীবনের সামগ্রিক আলেখ্য।
- **শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য-সঙ্গ ও উপদেশামৃত** :—সঙ্ঘসাধকের দিনলিপি। নৈতিক জীবন-গঠনের অমূল্য উপদেশাবলী।
- **শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ-শতরূপে, শতমুখে** :—তিন খণ্ড। শ্রীশ্রী-আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী লীলাসহচরগণের গুরুকৃপা লাভ।
- **শ্রীগুরুসঙ্গে : শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে** :— শ্রীগুরুসঙ্গ লাভের বিবরণ এবং যুগাচার্য্যের মহাজীবনের নানা দিকের তাত্ত্বিক আলোচনা।
- **শ্রীশ্রীসঙ্ঘগীতা** :—আচার্য্যদেবের অধ্যাত্ম উপদেশপত্র।
- **মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বামী প্রণবানন্দ** :—সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ্ প্রভৃতি বিদগ্ধ জনের মূল্যবান রচনা।
- **আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ ও শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ** :—সঙ্ঘের আদি ইতিহাস এবং সঙ্ঘনেতার আবির্ভাব, সিদ্ধি, সঙ্ঘ ও মঠ গঠন তথা তদীয় দিব্যভাগবতী লীলার সুললিত বর্ণনা ও তাৎপর্য্য।
- **এই পর্য্যায়ের আরো বই** :—শতাব্দীর নব জাগরণ ও আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ, তরুণের প্রণবানন্দ, শিশুদের প্রণবানন্দ, প্রণবানন্দোপদেশ, প্রণবানন্দ-স্মৃতিচয়ন, Ten Divine Messages, The Divine life Builder, শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ-লীলাস্মৃতি, শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ-সঙ্গ, নবজাতি সংগঠক স্বামী প্রণবানন্দ ( হিন্দী ), Prophet of the age ( যন্ত্রস্থ ), যুগমন্ত্র শ্রীশ্রীসংঘবাণী, আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ : যুবকল্যাণে ও যুবসংগঠনে, সংঘজীবন-নেপথ্যে।

# হিন্দু হুঁসিয়ার



স্বামী নির্ম্মলানন্দ

প্রকাশক :
স্বামী নির্মলানন্দ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ
বালিগঞ্জ, কলিকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন - ৪৪০৫১৭৮

সপ্তম সংস্করণ :
শ্রী শ্রী শিবরাত্রি
১লা ফাল্গুন - ১৪০৫
মুদ্রণ সংখ্যা - ২,০০০

মূল্য— ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রণে :
সেঞ্চুরী প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯



যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ-
প্রতিষ্ঠাতা— ভারত সেবাশ্রম সংঘ

# হিন্দু, হুঁসিয়ার

## ভারতে খৃষ্টান মিশনারী

**সর্ব্বনাশের আগুন ঐ যে ধাবিত তোমার পানে,**
**হিন্দু, রহিলে ঘুমে অচেতন ? শঙ্কা নাহি কি প্রাণে ?**
**চারিদিক হ'তে গুপ্ত আঘাত দেখিবারে নাহি পাও ?**
**হও হুঁসিয়ার, জাগো আর বার, বাঁচিবার ব্রত নাও।**
**ক্ষয়রোগী সম ক্ষ'য়েই চলেছ, মরণে হবে কি লীন ?**
**ভাবো পরিণাম, হও সাবধান, রহিওনা উদাসীন।**

**কেন এই হুঁসিয়ারি ?**

আজ হিন্দুকে হুঁসিয়ার করিতে চাই। কিন্তু কেন এই হুঁসিয়ারি ? এমন কি যুক্তিযুক্ত কারণ ঘটিল ? এই হুঁসিয়ারির প্রয়োজনীয়তাই বা কি ? আলোচ্য গ্রন্থে সে কথাই বলা হইবে।

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ হিন্দুর যে ভাবে সংখ্যা হ্রাস হইতেছে তাহা কাহারো অবিদিত আছে বলিয়া মনে হয় না। মুসলমান আমলের কথা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় মুসলমান বাহির হইতে এদেশে আসিয়া ভারতের হিন্দুগণকে ছলে বলে কৌশলে ধর্ম্মান্তরিত করিয়া তাহাদের জনসংখ্যা ৯ কোটিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উহার বিষময় ও দুঃখজনক প্রতিক্রিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে যাহা ঘটিয়াছে এবং আজো যাহা ঘটিতেছে তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত।

অখণ্ড ভারত বিভক্ত হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পাকিস্থানের দুইটি অঞ্চল গঠিত হয়। কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্থানের কবলে চলিয়া যায় এবং পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে ব্যাপক পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া ভবিষ্যৎ দেশখণ্ডনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৯৭১ সালে পাকিস্থান দুই টুক্‌রা হইয়া এক টুক্‌রায় বাংলাদেশ গঠিত

হয়। এই সব ঘটনার পরও ভারতের কোটি কোটি হরিজনকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়া এদেশে মুসলিমের সংখ্যা কুড়ি কোটিতে পরিণত করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে, সে বিষয়ের আলোচনা পরে আসিতেছে।

এই ঘটনার পাশাপাশি লোক-লোচনের অগোচরে ধীরে ধীরে অথচ সার্থকরূপে আর এক ব্যাপার যে ঘটিয়া চলিয়াছে সে সম্বন্ধে অধিকাংশ ভারতীয় নাগরিকই এখনো উপযুক্ত ভাবে অবহিত ও সাবধান হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে ভারতের হিন্দুজনগণকে অবহিত করাইতে চাই। ভারতে খৃষ্টান জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি তথা উহার সম্ভাব্য কুফলের কথা বলিতেছি। আজিকার দিনে ইহা ভারতের পক্ষে এক গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে একজন খৃষ্টানও ছিল না। কিন্তু আজ? লোকগণনার হিসাব মতে ভারতবর্ষে খৃষ্টানের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করুন ঃ—

| | |
|---|---|
| ইং ১৮৯১ সাল | ২৩ লক্ষ |
| ১৯০১ ,, | ৩০ ,, |
| ১৯১১ ,, | ৩৯ ,, |
| ১৯২১ ,, | ৪৮ ,, |
| ১৯৪১ ,, | ৬৩ ,, |

অতঃপর ইং ১৯৫১ সালের লোক-গণনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে আমাদের চক্ষু স্থির হইয়া যায়। ইং ১৯৪১ সালে ভারত ছিল অবিভক্ত। ইং ১৯৫১ সালে সর্ব্বপ্রথম বিভক্ত ভারতের লোক-গণনা হয়। উহাতে দেখা যায়, ঐ সালে খণ্ডিত ভারতে খৃষ্টানের সংখ্যা ছিল ৮৩ লক্ষের উপর, পাকিস্থানে ৫।।০ লক্ষ, অর্থাৎ দুইটি রাষ্ট্রে মোট ৮৮ লক্ষের উপর। সুতরাং, ইং ১৯৪১ সাল হইতে ইং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে ভারতের এই দুই অংশে খৃষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৫ লক্ষ। ইহার বাৎসরিক গড় আড়াই লক্ষ, মাসিক গড় ২১ হাজার, দৈনিক গড়

৭ শত। পাকিস্থানের কথা বাদ দিলে এই ক্ষয়ের বড় অংশটাই পড়ে ভারতের স্কন্ধে এবং হিন্দুদের উপর। এই ক্ষয় এখনো অধিকতর দ্রুত ও ব্যাপক আকারে চলিতেছে। তাই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি যাঁহাদের দরদ ও মমত্ববোধ আছে তাঁহারা সকলেই এই ব্যাপারে গভীর শঙ্কা ও উদ্বেগ বোধ করিতেছেন।

যে হারের কথা অলোচিত হইল বর্তমানে তদপেক্ষা অধিক হারে ভারতে খৃষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ইহার পরিণাম কিরূপ দাড়াইবে তাহা চিন্তনীয়। বর্তমান খৃষ্টান বন্ধুরা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে শাখাপ্রশাখায় বংশবৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণকে ব্যাপক ধর্ম্মান্তরিত করিয়া যদি তাঁহাদের দল আরো ভারী করিতে সমর্থ হন, তবে কোনও রূপ বিপ্লব না ঘটাইয়াও তাঁহারা নিছক সংখ্যাতত্ত্বের জোরে অদূর ভবিষ্যতে খৃষ্টানদের জন্য একটি পৃথক্ রাষ্ট্র দাবী করিতে পারিবেন। নাগাল্যাণ্ড ও মিজোল্যাণ্ড আন্দোলন তার দৃষ্টান্ত। সশস্ত্র নাগা ও মিজোরা বন্দুকের জোরে ভারত সরকারের চোখের ঘুম তো কাড়িয়াই লইয়াছিল। শান্তি আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার ত্রুটি করেন নাই ভারত সরকার। এক সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা দিতে কোনও বৈদেশিক পাদ্রীপুঙ্গবকে শান্তির দূত রূপে ডাকিয়া আনা হয়। কিন্তু ভদ্রলোকের কার্যকলাপ ও কথাবার্ত্তা উল্টো-পাল্টা। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সসম্মানে ভারত হইতে বিদায় দেওয়া হয়। সন্দেহ করা হয়, কার্যতঃ তিনি দেশদ্রোহীদেরই পৃষ্ঠপোষক। ভদ্রলোকের নাম মাইকেল স্কট্।

ভারতে এইরূপ ভদ্রলোক গুপ্ত ভাবে আরো কত জন আছেন কে জানে? তাঁহারা বৈরীবেশী নন, বন্ধুবেশী। এক হাতে বাইবেল এবং অন্য হাতে টাকার তোড়া নিয়া তাঁহারা ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছেন। ভারতে ইসলামের অভিযান ছিল রক্তাক্ত বৈপ্লবিক পন্থায়, আর বৈদেশিক মিশনারীরা সেই একই অভিযান চালাইতেছেন বুদ্ধিবল ও ধনবলের উপর নির্ভর করিয়া অতি কৌশলে ও চতুরতা সহকারে। দুই-এর পথ ভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য নাই। ভারতকে খৃষ্টানের

দেশে পরিণত করাই মিশনারীদের মূল উদ্দেশ্য। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা বলিতে চাই—"হিন্দু, হুঁসিয়ার!"

## খৃষ্টানদের সংখ্যাবৃদ্ধির মূল উৎস কোথায় ?

নদীর যেমন এক পার ভাঙ্গিয়া অন্য পারে চড়া পড়ে, তেমনি হিন্দুজন-তটিনীর এক তট ভাঙ্গিয়াই ভারতের খৃষ্টীয় সমাজের চড়াটী ক্রমশঃ স্থূল ও প্রসারিত হইতেছে। হিন্দুপ্রধান ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাষ্ট্রের মোট অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ছোটনাগ-পুরের সহস্র সহস্র পার্ব্বত্য হিন্দু আজ ধর্ম্মান্তরিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি সাঁওতাল পরগণা দ্রুত খৃষ্টান-প্রধান অঞ্চলে পর্য্যবসিত। গাঙ্গপুর ষ্টেটের প্রায় প্রত্যেকটী পাহাড়িয়া ভাই ও ভগ্নী, করেণ ও লুসাইগণ, পশ্চিম ভারতের ভীলরা, এবং মাণ্ডালা জেলার গোণ্ডা ও বৈগারা আজ স্বধর্ম্মচ্যুত। ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের লুসাই, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও নাগারা এবং দাক্ষিণাত্যের পাড়িয়া, পুলয়া ও মৎস্যজীবীদের দশাও একই। প্রতিটি চা-বাগানে সহস্র সহস্র শ্রমিকের মধ্যে মিশনারীদের বিপুল কর্ম্মতৎপরতা আমাদিগকে বিশেষ রূপে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত অসহায় ও উপেক্ষিত উদ্বাস্তুদের মধ্যেও তাহারা আজ বিশেষ ভাবে সক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল-দিগের মধ্যে এবং রাজবংশী, তিওর, ব্যগ্রক্ষত্রিয় ইত্যাদি অনুন্নত জনগণকর্ত্তৃক অধ্যুষিত অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারীদের বড় বড় ঘাঁটি আছে। কলিকাতা-টালিগঞ্জের কুদঘাটা হইতে নেপালগঞ্জ পর্যন্ত ৫ মাইল দীর্ঘ যে পাকা রাস্তাটী গিয়াছে, সে রাস্তায় কেহ কদাপি গেলে তিনি দেখিতে পাইবেন, পথের উভয় পার্শ্বের অধিকাংশ বাড়ীগুলিই ক্রুশচিহ্নিত। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এবং ২৪ পরগণার বাসন্তিয়া প্রভৃতি স্থানে মিশনারীদের কর্য্যকলাপ দেখিলে দর্শক মাত্রেরই তাক্ লাগিয়া যাইবে। মাদ্রাজের প্রায় যত্র তত্র মিশনারীদের প্রচার-কেন্দ্র। কেরালায় মিশনারীদের প্রাচীনতম ধর্ম্মান্তর ঘাঁটি। নানা সূত্রে ও নানা

কারণে যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। বস্তুতঃ হিন্দুরাই মিশনারীদের বড় শিকার।

গত ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে নিউ দিল্লীতে "World Council of Churches" এর যে আঠারো দিন ব্যাপী অধিবেশন হয় উহার প্রথম দিনের অধিবেশনেই "India will be a Christ's land" এই সঙ্কল্প-বাক্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ত্রিচিনপল্লীর ভারতীয় বিশপ সদম্ভে ঘোষণা করেন—"99 percent of our Country-men have still to be brought to the feet of Christ and first and foremost—the 250 millions of Hindus." উক্ত সম্মেলনে পৃথিবীর সমস্ত খৃষ্টান রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এমন কি, কম্যুনিষ্ট রাশিয়া হইতে চল্লিশ জন পাদ্রী আসিয়াছিলেন। উক্ত সম্মেলনে ভারতের ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্টগণের ভিতরের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া লইয়া ভারত-ভূমিকে প্রভু যীশুর অমরাবতীতে পরিণত করিবার জন্য সমস্ত চার্চ্চগুলিকে একযোগে এবং সুপরিকল্পিত পন্থায় কার্য্য করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। ইহার পর ইং ১৯৬৪ সালে বিশ্ব খৃষ্টান মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে ভারতে খৃষ্টানদের ধর্ম্মগুরু পোপের শুভাগমন এক বিশেষ অর্থপূর্ণ ঘটনা। এদেশে কার্য্যরত মিশনারীদের মধ্যে শক্তি, উৎসাহ, প্রেরণা ও মনোবল বৃদ্ধির জন্যই তাঁহার আবির্ভাব মাঝে মাঝে ঘটে। সত্য কথা বলিতে কি—ভারতের দরিদ্র ও নিরীহ হিন্দু ও উপজাতীয়গণকে গ্রাস করিবার জন্য এই সকল বৈদেশিক ধর্ম্মযাজক ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিয়ত থাবা বাড়াইয়া আছেন এবং বাগে পাইলেই তাহাদের ঘাড় মট্‌কাইতেছেন। তাই এ দেশবাসী হিন্দু ভ্রাতা ও ভগিনীদের উদ্দেশ্যে আমরা বারংবার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেছি।

**পুরাতন পরিসংখ্যান— বর্ত্তমান দুশ্চিন্তা**

"Directory of Churches and Missions in India and Pakistan, 1951" গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে

প্রকাশ ভারতে ও দেশীয় রাজ্যে ঐ সময়ে মিশনারীদের মোট ৩৬০৩টী শক্তিশালী প্রচার-ঘাঁটী ছিল। প্রচার-ঘাঁটীগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| আজমীর | ৮ | কচ্ছ | ১ |
| আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৫ | মধ্যভারত | ২৯ |
| আসাম | ১৭৮ | মধ্যপ্রদেশ | ১৭৬ |
| পশ্চিমবঙ্গ | ১১১ | মাদ্রাজ | ১০৯৩ |
| বিহার | ২০০ | মণিপুর | ৩ |
| বিলাসপুর | ১ | মহীশূর | ৯৫ |
| বোম্বে প্রদেশ | ২৮৩ | উড়িষ্যা | ৮২ |
| কুর্গ | ২ | পেপসু | ২০ |
| দিল্লী | ১৪ | পূর্ব্ব পাঞ্জাব | ১০১ |
| হিমাচল প্রদেশ | ৮ | রাজস্থান | ২১ |
| হায়দরাবাদ | ২৫৬ | সিকিম | ৪ |
| ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন | ৫৪৯ | সৌরাষ্ট্র | ৪ |
| উত্তর প্রদেশ | ৩১২ | ত্রিপুরা রাজ্য | ১৩ |
| কাশ্মীর | ১৫ | বিন্ধ্য প্রদেশ | ১১ |

এ হিসাব নগণ্য। ইং ১৯৫১ সালের পর মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে আরও কত নূতন নূতন ঘাঁটী যে গড়িয়া উঠিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেকটী ঘাঁটীর সহিত এক বা একাধিক গীর্জ্জা এবং তৎসংশ্লিষ্ট স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ, শিল্পশালা প্রভৃতি আছে। এই সব ঘাঁটী হইতেই তাঁহারা সারা ভারতে ধর্ম্মপ্রচার অভিযান চালাইতেছেন। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয় যে, এই সব ঘাঁটীগুলি খুব সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতেই তৈয়ারী হইয়াছে ও হইতেছে। রাষ্ট্রীয় শাসনের সুবিধার জন্য যেমন প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা ইত্যাদিক্রমে সমগ্র ভারতকে ভাগ করা হইয়াছে, ধর্ম্মীয় প্রচারের পরিকল্পনায় তেমনি সমগ্র ভারতবর্ষ মিশনারীগণ কর্তৃক প্রদেশ, বিভাগ,

জেলা, মহকুমাদিক্রমে বিভক্ত। ইহাকে বলা যায়—Ecclesiastical Division of India. ভারতে এইরূপ ১৫টী যাজকীয় প্রদেশ বিদ্যমান। যথা ঃ—(১) দিল্লী-সিমলা, (২) আগ্রা, (৩) কলিকাতা (৪) রাঁচি, (৫) নাগপুর, (৬) বোম্বাই, (৭) হায়দ্রাবাদ, (৮) মাদ্রাজ-মইলাপুর, (৯) পণ্ডিচেরী, (১০) ব্যাঙ্গালোর, (১১) মাদুরা, (১২) ভেরাপল্লী, (১৩) সিরোমালাঙ্কার (১৪) সিরোমালাবার (ক), (১৫) সিরো-মালাবার (খ)। এই সব প্রদেশগুলি আবার বিভিন্ন ডিভিসন্ বা বিভাগ-ক্রমে বিভক্ত। যথা :—আগ্রা প্রদেশের অধীনে আজমীর, ইন্দোর, এলাহাবাদ, গোরখপুর এবং ঝাঁসী ; কলিকাতা প্রদেশের অধীনে কৃষ্ণনগর, মালদহ, পাটনা, শিলং, জলপাইগুড়ি, হাফলং, সিকিম, ডিব্রুগড়, রাঁচীর অধীনে সম্বলপুর কটক ইত্যাদি। সমগ্র ভারতে এইরূপ ৫৫টী যাজকীয় ডিভিসন্ বা বিভাগ বর্ত্তমান। এই সকল বিভাগের অধীনে অসংখ্য জেলা এবং জেলার অধীনে পরিকল্পিত মহকুমাগুলি।

এই সব ধরণ-ধারণ দেখিয়া মনে হয় সার্ব্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের ভিতরেই আর একটী Ecclesiatical State প্রায় গঠিত হইয়া গিয়াছে। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"—কবির এই কাব্যগাঁথা আমাদের চেয়ে এঁরাই বুঝিয়াছেন ভাল এবং সেই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তাঁহারা ভারতের বুকে শক্ত করিয়া খুঁটী গাড়িতে শুরু করিয়াছেন। এদেশের অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অন্নক্লিষ্ট, এদেশের জনতা প্রতিবাদ ও প্রতিকারপরাঙ্মুখ, এদেশের রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও উদাসীন। সত্যই তো এমন আহাম্মোকের দেশ আর কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ? কিন্তু, আমরা ভাবি —এইরূপই যদি চলিতে থাকে, তবে এদেশবাসীর বংশধরদের ভবিষ্যৎ কি ?

## প্রচার-বাহিনী (১৯৫১ সালের হিসাব)

খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারক-বাহিনী একটি বিরাট ফৌজ বিশেষ। এই বাহিনী যেমন বিশালায়তন, তেমনি শক্তিশালী ও সর্ব্ববিধ

আবশ্যকীয় উপকরণ সুসজ্জিত। এই বাহিনীর শীর্ষস্থানে আছেন সেরা বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ। ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং নানা ধরণের পুরুষ ও নারী কর্মী লইয়া এই বাহিনী সংগঠিত। যিনি যে ক্ষেত্রে যে পদাভিষিক্তই থাকুন না কেন, সকলে এক মূল উদ্দেশ্যের জন্যই কার্য্য করিতেছেন। যিনি যে ক্ষেত্রে কার্য্যরত আছেন, তিনি সেই সেই আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্ত করিয়া নিয়াছেন, যাহাতে সেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত অবাধে মেলামেশা ও বাক্যালাপ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে পারেন যে যীশুই একমাত্র পরিত্রাতা এবং তাঁহাকে আশ্রয় না করিলে মুক্তি নাই। মিশনারীদের প্রচারক ও কর্মী বাহিনী যে কি বিশাল, আমরা নিম্নে উহার কিছু নমুনা দিতেছি।

মিশনারী ডাইরেক্টরীর ইং ১৯৪১ সালের বিবরণে প্রকাশ—ঐ সময়ে সমগ্র ভারতে মিশনারীদের অধীনে যে সব কর্মী কার্য্যরত ছিল তাহাদের **সংখ্যা ৫৫,৯৭৭**; ইঁহাদের মধ্যে ধর্মযাজকের ক্ষমতাপ্রাপ্তের সংখ্যা ৪,৯৬৪; ডাক্তার ও নার্স ৩,৮৫০; বাকী সব শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী এবং অন্যান্য শ্রেণীর কর্মী। সম্ভবতঃ শ্রমিকদের সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ইংরাজী ১৯৫১ সালের বিবরণে পাদ্রীদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়ে ভারতে মোট ৯,৭১৯ **জন পাদ্রী** কার্য্যরত ছিলেন। তন্মধ্যে **দেশীয় পাদ্রী ৫,৩৪২ জন; বিদেশীয় ৪,৩৭৭; পুরুষ ৫,৮৮৩; মহিলা প্রচারিকা ৩,৮৩৬।**

মিশনারীদের আগমন-স্রোত থামিয়া নাই। তাঁহারা কেবলই আসিতেছেন। ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ এই দশ বৎসরের হার বিচার করিলেই অনুমান করা যায় কিরূপ গতিতে তাঁহাদের আগমন ঘটিতেছে! হাল আমলের কোন পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নাই। কিন্তু সেই সংখ্যাটি যে অতিশয় বিপুলায়তন হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। ভারতে খৃষ্টীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী, দুর্জ্জয় ও সফল করিয়া তুলিতেই তাঁহাদের শুভাগমন এবং কর্ম্মতৎপরতা।

## ভারতে খৃষ্টানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণ কি কি ?

### প্রথম কারণ

ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের দ্বারা এদেশের ভদ্র ও শিক্ষিত জনগণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার অপপ্রয়াস ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থপ্রায় হইয়া গেলে মিশনারীরা অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ভারতের নিভৃত পল্লী ও পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলিতে ঘাঁটী স্থাপন করিয়া তথাকার অজ্ঞ, অশিক্ষিত, সরল ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে প্রচার করিতে থাকিলেন। এই প্রচার কার্য্য যে নিছক প্রেমের দ্বারা হইয়াছিল তাহা মনে করিবার হেতু নাই। ধর্ম্মপ্রচারের নামে এমন সব উপায় অবলম্বন করা হইত, যাহা শুধু ধর্ম্মযাজকগণের পক্ষে নয়, পরন্তু যে কোন স্তরের ব্যক্তির পক্ষেই গর্হিত কার্য্য। **Dr. Verrier Elwin, D. SC., F. N. I., F. R. A.** নামধেয় জনৈক শ্বেতাঙ্গ নৃতত্ত্ববিৎ ও ধর্মযাজকের লিখিত* বিবরণে খৃষ্টধর্ম প্রচারণার যে অপচিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই বড় লজ্জাকর। মিশনারীদের দুর্নীতির সহিত সহযোগিতায় অক্ষম হইয়া তিনি খৃষ্টধর্ম প্রচারের কার্য্যে ইস্তফা দেন।

মিশনারীদের প্রচারনীতি ও প্রচারপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার বিবরণে যাহা প্রকাশ এবং এই বিষয়ে আমাদেরও যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তাহা এই। এদেশের পল্লীবাসী দরিদ্র জনগণ এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই দরিদ্র ও শ্রমজীবী। মিশনারীরা তাহাদের এই দারিদ্র্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অর্থ দিয়া নিজেদের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন এবং তৎপরে চিরাচরিত দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য চাকুরী বরখাস্তের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য বাধ্য করিতেন। সহরবাসী উচ্চশিক্ষিত বহু বেকার যুবককেও চকুরীর লোভ দেখাইয়া

* Religious Banditry, published by All India Arya ( Hindu ) Dharma Seva Sangha, Delhi.

ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নয়। মহাজনী ব্যবসায়ে মিশনারীদের খ্যাতি সম্ভবতঃ স্বাধীন ভারতেও ম্লান হয় নাই। ইংরাজ আমলে দরিদ্রগণকে ধর্মান্তরিত করিবার ইহা ছিল তাঁহাদের প্রাথমিক ফাঁদ-বিশেষ। বিপদের সময় তাঁহারা দরিদ্রদিগকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ কর্জ্জ দিতেন। তারপর যে খাতক নিয়মিত গীর্জ্জার সাপ্তাহিক প্রার্থনায় যোগদান করিত, তাহার সুদ কমাইয়া দেওয়া হইত এবং ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে তাহার সুদ একেবারেই মাপ হইয়া যাইত। পার্ব্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মদ্যপ। সুরা ও অর্থ উপঢৌকন দ্বারা পাহাড়িয়া দলপতিদিগকে হাত করিয়া অবশেষে হাতীর দ্বারা হাতী বশ করিবার মত উক্ত দলপতিদের দ্বারাই পাহাড়িয়াদিগকে কি ভাবে শিকার করা হইত উহার এক বিবরণ **Dr. Elwin** এর প্রবন্ধ হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

**"Leading Gonds are bribed with money and liquor to assist the mission ; and on one occassion recently one such mission agent made the people of a village drunk and in this condition persuaded them to write a petition asking for a Catholic School."**

অর্থাৎ—গোণ্ডা দলপতিদিগকে অর্থ ও মদ্য উপঢৌকন দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা মিশনারীদের কার্যে সহায়তা করে। সম্প্রতি একটি ক্ষেত্রে কোন এক মিশনের দালাল একটী গ্রামের সমগ্র অধিবাসীকেই মদ্যপান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া নেয় এবং এই অবস্থায় তাহাদিগের দ্বারা একটী ক্যাথলিক স্কুলের জন্য এক দরখাস্ত লিখাইয়া লয়।

বিবরণটী পরাধীন ভারতের। তখন শুধু গোণ্ডাদের মধ্যেই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও অজ্ঞ, অসহায়, দরিদ্র জনগণের মধ্যে অনুরূপ ঘটনা অজস্র ঘটিত। প্রায় সকল স্থানেই মিশনারীদের অনুগ্রহভাজন লোক কিছু কিছু থাকিত। মিশনারীরা তাঁহাদের কার্য্য উদ্ধারের জন্য

তাহাদিগকে প্রচুর উপঢৌকন দিতেন ; তাহাদের পুত্রকন্যাগণের বিবাহাদিতে যৌতুক ও প্রীতি উপহার পাঠাইতেন ; তাহাদের বিপদাপদে সহায়তা করিতেন এবং মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগকে তুষ্ট রাখিতেন।

বিপদে সাহায্য, মিষ্টালাপ, সদ্ব্যবহার নিশ্চয়ই যে খুব ভাল জিনিস, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? তজ্জন্য কোনো দিনই কোনো কথা উঠিত না, যদি না তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইত অন্যরূপ।

## দ্বিতীয় কারণ

একশ্রেণীর জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া এদেশে খৃষ্টানের সংখ্যা কম বৃদ্ধি হয় নাই। পল্লীবাসী অজ্ঞ জনগণ এবং পর্ব্বত ও অরণ্যবহুল অঞ্চলের নিরীহস্বভাব অধিবাসীরা বহির্জগতের সঙ্গে খুব অল্পই পরিচিত। সুতরাং, খৃষ্টান পুরোহিত বা মিশনারীদের বেতনভোগী অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ক্ষমতার দম্ভ, আড়ম্বর ও লম্বা চওড়া বক্তৃতায় তাহারা সহজেই ভুলিয়া যাইত এবং মনে করিত, ইহারা অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন লোক। কোনো কোনো সময়ে মিশনারীরা গভর্ণমেণ্টের লোক বলিয়া মিথ্যা আত্মপরিচয় দিতেন এবং চার্চ্চে না গেলে বা মিশনারী স্কুলে ছেলে না পাঠাইলে তাহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়া উচ্চতর রাজকর্ম্মচারীদের সহিত যোগসাজসে আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় অবৈধ হস্তক্ষেপপূর্ব্বক এক পক্ষকে জয়লাভ করাইয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সরলমতি অজ্ঞ জনগণের তাই ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, মিশনারীরা না করিতে পারেন এমন কার্য্য নাই এবং তাঁহারা প্রসন্ন হইলে যে কোনও বাঞ্ছিত ফলই দিতে পারেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অতীতে বহু অজ্ঞ লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস করিয়াছে।

মিশনারীদের উক্ত ক্ষমতার দম্ভ শুধু মৌখিক অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ উহা প্রকাশ হইয়া

পড়িত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অজ্ঞ জনগণের নিকট সত্য সত্যই তাঁহারা আতঙ্কভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। Dr. Elwin মাণ্ডালা জেলায় মিশ-নারীদের পীড়নমূলক আচরণের নিন্দা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন—"I have never in all my thirteen years experience of aboriginal India seen an area more cowed down by fear than in Mandala at present. The fathers have a wide spread reputation for beating, threats and abuse; * * * The word "Padre" is now used in the District as a bugaboo to scare children. The old mythology of Rakshasa and Dano has been replaced by a new fantasy of "Padre" and "Father." "The Padre will beat you if you do'nt behave"—Says a harassed mother to a naughty child. What a comment on the gospel of love."

Dr. Elwin যাহা বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে তাহা জ্বলন্ত সত্য। প্রেমিক প্রভুর পবিত্র নাম-প্রচারকদের এই অপকীর্ত্তির বিবরণ ভারত কখনো বিস্মৃত হইবে না।

### তৃতীয় কারণ

হিন্দু-সমাজে একদা প্রচলিত অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার ফলেও বহু অনুন্নত হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু-সমাজে এমন এক শ্রেণীর নরনারী আছে, যাহারা অন্য শ্রেণীর নিকট অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়। বহু অনুন্নত হিন্দু কোথাও কোথাও পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, বেহারা পাইত না, শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ; সাধারণের পূজাস্থানে বা মন্দিরে তাহারা প্রবেশ করিতে পারিত না। উচ্চবর্ণের পথচারীকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য মাদ্রাজের পারিয়াদিগকে

গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া পথ চলিতে হইত। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা এখন আর তেমন উগ্র নয়। কিন্তু অতীতে মিশনারীরা এই সুযোগ সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতেন। দেশের নেতৃবৃন্দ যখন বুঝাইতেন যে দেশ স্বাধীন হইলে নিজেদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসিবে এবং তখন আইনের বলে অত্যল্পকালের মধ্যেই দেশ হইতে যাবতীয় অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা দূর করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং, অনুন্নত ও উপজাতীয়-গণের কর্ত্তব্য একযোগে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলা, সে ক্ষেত্রে দুরভিসন্ধিপরায়ণ মিশনারী বন্ধুরা সর্ব্বদাই তাহাদিগকে অন্যরূপ বুঝাইতেন। ব্রিটিশ আমলে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত "প্যারা হড়" শীর্ষক সাঁওতালী সাময়িকের একখণ্ড একবার হাতে পড়িয়াছিল। পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে সাঁওতালগণকে হিন্দুদের সহিত মৈত্রী ও সহযোগিতা স্থাপন করিতে খোলাখুলি নিষেধ করা হইয়াছে। যুক্তি এই যে, আজ হিন্দুরা বিপদে পড়িয়া সাঁওতাল প্রভৃতিকে দলে টানিতেছে বটে, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধি হইয়া গেলে আবার তাহাদিগকে জঙ্গলী, অনার্য, অসভ্য বলিয়া তাড়াইয়া দিবে, যেমন রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য বানরগণকে দলে টানিয়াছিলেন ; সীতা উদ্ধার হইয়া গেলে আবার তাহাদিগকে বানর, ভল্লুক বলিয়া তাড়াইয়া দেন। কি মিথ্যা কথা! মূল রামায়ণের সহিত অপরিচিত সাঁওতাল ভাইরা এই মিথ্যা প্রচার কেমন করিয়া বুঝিবে? সুতরাং, তাহাদের পক্ষে এই কুযুক্তি বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। এইরূপ অহরহঃই ঘটিত।

অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় হিন্দুগণকেও ঠিক এই ভাবেই বুঝানো হইয়াছে। হিন্দু-সমাজটা কুসংস্কার ও অবিচারের একটা মস্ত আস্তাকুঁড়—এই কথাটা তাঁহারা এত বড় করিয়া এবং এত রঙ চড়াইয়া প্রচার করিতেন যে, ফলে এক শ্রেণীর নরনারীর মন স্বভাবতঃই স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিত। তার পরিণাম—সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ।

অথচ, আশ্চর্য্যের কথা—এই সকল শ্বেতাঙ্গপ্রভুদের স্বজাতীয়রাই নিজ নিজ দেশে কালা আদমীর উপর যথেচ্ছ অবিচার ও অত্যাচার করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের দক্ষিণ রাজ্য-গুলিতে বর্ণবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্য এতই মারাত্মক ছিল যে, কোনও সভ্য সমাজ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। সেখানকার কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের উপর যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করা হইত। সাধারণ রেস্তোরাঁ-হোটেল, সরকারী স্কুল-কলেজ, পার্ক-ময়দান, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদিতে নিগ্রোদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এমন কি শ্বেতাঙ্গ পল্লী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আলাদা করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিগ্রোরা রাজ্যে রাজ্যে অহিংস আন্দোলন গড়িয়া তুলিলে তাহাদের প্রতিবাদ মিছিলে শ্বেতাঙ্গ বর্ণ-বিদ্বেষীরা দুর্দ্ধর্ষ অ্যাল্‌সেশিয়ান্‌ কুকুর লেলাইয়া দিত, উপর হইতে পাইপের দ্বারা সজোরে জল ঢালিয়া দিত এবং আরো নানা প্রকারে তাহাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে "নাগরিক অধিকার বিল" পাশ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও বর্ণবিদ্বেষীদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন কতটা হইয়াছে, বলা যায় না। বৃটেনেও কালা আদমীরা অধুনা অবাঞ্ছিত এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার শিকার। দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্তও তুলিয়া ধরা যায়।

ভারতবর্ষের কথাই বলি। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পরও অনুন্নত ও উপজাতীয় হিন্দুগণের শ্রেণী-উপশ্রেণীগত ভেদাভেদের শৃঙ্খল দূরীভূত হইত কি? বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীর জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ গীর্জ্জা এবং প্রার্থনার সময় পৃথক্‌ পৃথক্‌ আসনের ব্যবস্থা থাকিত। এমন কি ছাত্রাবাস গুলিতেও তাহাদের জন্য পৃথক্‌ ব্যবস্থা। অথচ, ইঁহারাই আবার হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি ধরিয়া অজস্র নিন্দাবাদ করেন।

শ্রীজগজীবন রাম (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী) অন্ধ্রপ্রদেশ অনুন্নত-শ্রেণী কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"ইংরেজ শাসনে

বিপুল সংখ্যক হরিজনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। এখনো হায়দরাবাদ ও মধ্যপ্রদেশ এবং যে সব স্থানে পুর্ব্বে হয় নাই এইরূপ স্থান হইতেই ধর্ম্মান্তরিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দ্রুতগতিতে ধর্ম্মান্তর কার্য্য চলিতেছে।" তাঁহার সেই সময়ের ভাষণে প্রকাশ—তিনি এইরূপ ধর্ম্মান্তরের বিরুদ্ধে পঁচিশ বৎসর যাবৎ সংগ্রাম করিতেছেন এবং এই সময়ের মধ্যে সাত হাজার হরিজনকে হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। একজন খৃষ্টান পাদ্রী তাঁহারই সম্মুখে ক্রোধে অন্ধ হইয়া এক কালীমুর্ত্তি পদাঘাতে চূর্ণ করিয়াছিল, সে কথাও তাঁহার ভাষণে উল্লিখিত হয়। হরিজন ও অনুন্নতগণের দ্রুত ধর্ম্মান্তরের চাঞ্চল্যকর কাহিনী বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন—"এই ধরণের ঘটনা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।"

আমরাও তাঁহার সহিত একমত। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা বর্ত্তমান ভারত-রাষ্ট্রে আইনতঃ নিষিদ্ধ। সামাজিক ক্ষেত্রে এখনো কিছুটা রক্ষণশীলতা বিদ্যমান থাকিলেও অনেকাংশে তাহা শিথিল হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আরও একটি কথা—দক্ষিণ আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার ন্যায় উগ্র বর্ণবিদ্বেষের অস্তিত্ব ভারতে নাই। যেটুকু যাহা আছে তাহার মীমাংসা আমরা নিজেরাই করিব, সে শক্তি আমাদের নিজেদের আছে। বৈদেশিক বন্ধুরা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক না গলাইলেই আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিব। তাঁহারা পতিতোদ্ধারক সাজিয়া যদি একান্তই নাক গলাইতে আসেন, তবে সেই ঘটনাকে গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিয়া আমাদিগকেও গলা বাঁচাইবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।

### চতুর্থ কারণ

ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের সঙ্গে আর একটি জিনিস আসিয়াছে, উহা হইল হিন্দুধর্ম্মের অপপ্রচার। এই ছিদ্রপথেও হিন্দুর যে-পরিমাণ

ক্ষয় সাধিত হইয়াছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নয়। হিন্দুরা পৌত্তলিক, হিন্দুর দেবদেবীরা কাল্পনিক, হিন্দুর শাস্ত্রগুলি কুরুচিপূর্ণ, হিন্দুর গুরু-গোঁসাইরা চরিত্রহীন—এই সব অপপ্রচার যথেষ্ট হইয়াছে এবং এখনো একেবারে বন্ধ হইয়াছে, বলা যায় না। মিশনারীগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এই ধরণের আপত্তিকর একখানি বাংলা পুস্তক একদা আমরা দেখিয়াছি। উহাতে হিন্দুধর্মের, হিন্দুর দেবদেবী ও অবতার পুরুষগণের, হিন্দুর রামায়ণ-মহাভারতাদি শাস্ত্র গ্রন্থের এবং হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী ও গুরু-গোস্বামীদের আদ্যশ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। এই ধরণের অপপ্রচারের সময় সংশ্লিষ্ট বন্ধুরা ভুলিয়া যান যে, হিন্দুরাও ইহার পাল্টা জবাব দিতে জানে। সেমিটিক ধর্ম্মগুলি সম্বন্ধেও নানা কূটপ্রশ্ন ও দার্শনিক বিচার তোলা যায়। আর দুই দশটি আদিরসাত্মক ছত্র বা পঙ্‌ক্তির জন্যই যদি হিন্দুর কাব্য-পুরাণাদি গ্রন্থগুলি অপাঙ্‌ক্তেয় বিবেচিত হয়, তবে সেই অপাঙ্‌ক্তেয়তার অভিযোগ হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থও কি রেহাই পায়? আদিরসের ঘটনার ছড়াছড়ি সেখানেও নেহাৎ কম আছে নাকি? যদি উহার একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়া সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরি, তবে তাহা কি ভাল হইবে? অবশ্য তাহা করিব না; আবর্জ্জনা ঘাঁটা আমাদের কাজ নয়, উহা আমরা সত্যই আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করি।

হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। পল্লীবাসী অজ্ঞ ও অশিক্ষিত হিন্দুরা সরল বিশ্বাসে ও চিরাচরিত প্রথা হিসাবে ধর্ম্মাচরণের অঙ্গরূপে নানাবিধ পূজা-উৎসব, ব্রত-পার্ব্বণ, জপ-তপ, তীর্থদর্শনাদি করিয়া থাকে, কিন্তু সেগুলির তত্ত্ব ও উপযোগিতা বুঝে না; আর কেহ তাহাদিগকে বুঝাইয়াও দেয় না। তাই অপপ্রচারকারীদের কূট প্রশ্নের কোনো জবাব তাহারা দিতে পারে না; ফলতঃ পরাজয় বরণ করে। এইরূপ পৌনঃপুনিক পরাজয়ের মধ্য দিয়া তাহাদের মনোবল কমিয়া যায় এবং স্বধর্ম্ম ও স্বসংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা সংশয় ও জটিলতা তাহাদের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইয়া দেয়।

শুধু অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নয়, শিক্ষিতদের অবস্থাও তথৈবচ। একদা শিক্ষিত বলিতেই বুঝাইত ইংরাজী শিক্ষিত। এই শ্রেণীর পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে এই ধারণাই ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া উঠিয়াছিল যে, যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাই উপাদেয় ও যুক্তিযুক্ত, আর যাহা কিছু প্রাচ্য তাহাই হেয় ও অযৌক্তিক। এই সর্ব্বনাশা মনোবৃত্তির পশ্চাতে অধিকতর ইন্ধন জোগাইত ঐ সব ভিত্তিহীন অপপ্রচার। ফলে একদল অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তি না বুঝিয়া এবং একদল বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত ব্যক্তি ভুল বুঝিয়া পিতৃ-পিতামহের আচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈদেশিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

**পঞ্চম কারণ**

কথাটা একটু শ্রুতিকটু হইলেও বলিতে হইবে। সত্য কথা বলিতে আর বাধা কি? কথাটা হইল এই যে, ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয় না করা পর্যন্ত মানুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু যৌন দুর্ব্বলতা থাকেই থাকে। বৈদেশিক মিশনারী বন্ধুরা নর-নারীর এই সহজাত যৌন দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণেও ত্রুটি করেন নাই। খৃষ্টান যুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া হিন্দু যুবকের, অথবা খৃষ্টান যুবকের প্রণয়ে হিন্দু যুবতীর ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত অতীতে যথেষ্ট মিলিয়াছে। বর্ত্তমানেও অনুরূপ ঘটনার বহু সংবাদ আমরা পাই। এই সব ক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রত্যক্ষ কোনো হাত থাকে কি না জানি না। কিন্তু, তাঁহাদের সমর্থনের অভাব ঘটে না তাহা বলাই বাহুল্য। কেন না, এই জাতীয় প্রণয়ঘটিত যাবতীয় বিবাহ গীর্জাঘরে মিশনারী পুরোহিতের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। কই, আজ পর্য্যন্ত একটি ক্ষেত্রেও তাঁহারা এই জাতীয় বিবাহ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তো শুনা যায় না। কিংবা, বর-কন্যার অভিভাবকগণের মতামত জানাও তো আবশ্যক মনে করেন না।

**ষষ্ঠ কারণ**

মিশনারীগণ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্ম্মান্তরিত করণের এক একটি ঘাঁটী বলিলে একেবারেই অত্যুক্তি হয় না। ব্রিটিশ রাজত্বে তাঁহাদের প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনে বাইবেল পাঠ তো অত্যন্ত বাধ্যতামূলক ছিল। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরাও উহা হইতে অব্যাহতি পাইত না। মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত স্কুল বা কলেজ হোস্টেলে যে সব হিন্দু বিদ্যার্থী নানা কারণে অবস্থান করিতে বাধ্য হইত, তাহাদিগকেও শৃঙ্খলারক্ষার অজুহাতে গীর্জ্জায় যাইতে হইত। কিঞ্চিৎ শিথিল হইলেও এই সকল নিয়ম এখনো অব্যাহত।

১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত সারা ভারতে মিশনারীরা যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালন করেন, উহাদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ—

কলেজ ৩৬, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ৩৫২, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৬৯৯, মূক-বধির বিদ্যালয় ৯, রবিবারের স্কুল ২২,৭৪৭, ধর্ম্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় (Theological) প্রতিষ্ঠান ৩৬, বাইবেল স্কুল ৭১, মিশনারীদের সন্তান-সন্ততির জন্য শিক্ষালয় ১১, শিল্পশিক্ষা ভবন ৮৯, ছাত্রাবাস ৭৬।

ঐ সালে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কত ছাত্র-ছাত্রী ছিল তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তবে ইংরাজী ১৯৪১ সালের বিবরণে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতেই ছাত্রছাত্রী সংখ্যার বিশালতা আমরা অনুমান করিতে পারি। ইং ১৯৪১ সালে মিশনারীদের পরিচালিত শিক্ষায়তনগুলিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৭, ৭৪,৫৮৬, অর্থাৎ প্রায় ১৮ লক্ষ। উক্ত শিক্ষায়তন সমূহে সাধারণ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয় না। মিশনারীদের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাপদ্ধতি আয়ত্ত করিবার জন্য রীতিমত তাহাদিগকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হয়। মিশনারী শিক্ষকদের জন্য এইরূপ ১০৫টি শিক্ষায়তন (Teacher's Training Institution) এর কথা জানা যায়।

উক্ত পরিসংখ্যান হাল আমলের নয়—১৯৫১ খৃষ্টাব্দের। বেশ পুরাণো হইয়া গিয়াছে এই পরিসংখ্যান। কিন্তু, পরিস্থিতির চিত্রটি তুলিয়া ধরিতে এই পুরাণো পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর। খৃষ্টীয় পরিবেশে শিক্ষালাভ, বাইবেল অধ্যয়ন ও গীর্জায় যোগদান, খৃষ্টান বান্ধব ও বান্ধবীদের সহিত সর্বদা মেলামেশা, সর্ব্বোপরি মিশনারী শিক্ষক ও পুরোহিতদের প্রভাব। এই সবের মিলিত প্রতিক্রিয়া সকল ক্ষেত্রে না হইলেও বহু ক্ষেত্রেই যে হইত বা এখনো হয় তাহা আশ্চর্য্যজনক কিছুই নয়।

**সপ্তম কারণ**

আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি যে প্রায় প্রত্যেকটি চার্চ্চের সঙ্গে সঙ্গেই কোন না কোন প্রকার জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; ১৯৫১ সালের অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

কৃষি প্রতিষ্ঠান ৬২, সমবায় প্রতিষ্ঠান ৩৯, বিবিধ শিল্পশালা ৩৩, বিশ্রাম ভবন ১৯, হাঁসপাতাল ২৫৫, ডিস্পেনসারী ২৫৩, কুষ্ঠাশ্রম ৬৮, যক্ষ্মা হাতপাতাল ১২, নারীকল্যাণ আশ্রম ৩০, ধর্ম্মান্তরিতগণের জন্য আশ্রয় ভবন ১০, অনাথালয় ১২৮।

তাছাড়া ঐ সময়ে শিশুকল্যাণ আশ্রম, পল্লীউন্নয়ন কেন্দ্র, পাঠাগার, বিধবাশ্রম প্রভৃতি মিলিয়া আরো প্রায় ৪০টি প্রতিষ্ঠান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে এই সংখ্যা বহুগুণে বর্দ্ধিত।

বাহ্যতঃ এই সব প্রতিষ্ঠান দেখিতে খুবই ভাল এবং সদিচ্ছামূলক। কিন্তু, উপরে উপরে যতই জনসেবার লেবেল আঁটা থাকুক না কেন, এগুলির আসল উদ্দেশ্য আজ আর কাহারো অবিদিত নাই। এগুলি যে ধর্মান্তরিত করণেরই গুপ্ত ফাঁদ বিশেষ তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহারা এদেশের দরিদ্র জনগণকে কপট দয়াদাক্ষিণ্য ও পরোপকারিতা দেখাইবার সুযোগ করিয়া লন এবং এতদুপায়ে ধীরে ধীরে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন।

**অষ্টম কারণ**

অন্য সব কথা বাদ দিলেও শুধু মাত্র সাধারণ প্রচারকার্য্যের কথা যদি ধরি, তবে সে ক্ষেত্রেও মিশনারীদের বিপুল আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। মিশনারী ধর্ম্মযাজকের সংখ্যা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উহারা কেহই বসিয়া নাই; প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত। ১৯৫১ সালের বিবরণ হইতেই বলি। ঐ সময়ে প্রচারক তৈরী করিবার জন্য সারা ভারতে মিশনারীদের ৯৮টি শিক্ষায়তন ছিল। আর সাধারণ প্রচারণার (**General Propaganda**) সৌকর্য্যার্থে যে সব সাহিত্য দরকার, সেগুলি মুদ্রণের জন্য ভারতবর্ষে মিশনারীদের নিজস্ব বৃহৎ ছাপাখানা ছিল ৩৯টি। কত আকারে প্রকারে কত প্রকার সাহিত্যই যে তাঁহারা নিত্য নিত্য ছাপিতেছেন এবং বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে পথে ঘাটে বিলি করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সাল পর্য্যন্ত ১০৯টি বুক ডিপো হইতে বাইবেল সরবরাহ করা হয়। যে বইখানির মূল্য বাজারে অন্যূন ২০।২৫ টাকা হওয়া উচিত, তেমনি একখানি বই মিশনারীদের নিকট মাত্র ৫ টাকায় মিলিবে। ভারতের হেন ভাষা বোধ হয় কমই আছে, যে ভাষায় তাঁহাদের প্রচার-সাহিত্য নাই। ঐ সময়ে ভারতের ১৮টি ভাষায় মোট ১৮৬টি খানি সাময়িক তাহারা চালাইয়াছেন এবং তাহাও অতি সস্তা দরে। আসল কথা এই—ভারতে মিশনারীদের প্রচার-আয়োজন সকল দিক হইতেই বিপুল এবং সুপরিকল্পিত। এই আয়োজনের উপকরণও বাড়িয়াই চলিয়াছে। অর্থও তাঁহারা জলের মত ঢালিতেছেন। যদিও তাঁহাদের মধ্যেও সম্প্রদায়ের অভাব নাই, তথাপি তাঁহাদের কার্য্যধারা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত। পরস্পরের সহিত ঐক্য, সংযোগ ও সহযোগিতা রক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নাই। কেন্দ্রে কেন্দ্রে বহু সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সবগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আবার একটি প্রতিনিধিমূলক কেন্দ্রীয় সংস্থা কার্য্য

করিতেছে। শেষোক্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি **National Christian Council** নামে সুপরিচিত।

**নবম কারণ**

ভারতের দিকে দিকে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদ নানা আকারে ও নানা প্রকারে। আমরা সশস্ত্র নাগা ও মিজোদের কথা জানি, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের কথা জানি, পাঞ্জাবের উগ্র পন্থীদের তাণ্ডবের কথাও জানি। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের নেপালি অধ্যুষিত দার্জ্জিলিং সহর আর এক বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুনে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই প্রকার জাতীয়তাবিরোধী ছোট-বড় অভ্যুত্থান নানা স্থানেই ঘটে, দেখা যায়। ভারত সরকার বিব্রত হন, দেশের জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হয়, বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়, প্রচুর সম্পত্তির বিনাশ ঘটে। এই সকল বিচ্ছিন্নতাবাদের পশ্চাতে কাহাদের গোপন হস্ত সক্রিয়? মদত জোগায় কাহারা? সরকারী ও বেসরকারী স্তরে প্রায়ই বিদেশীদের চক্রান্তের কথা বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি মিশনারীদের প্রসঙ্গই উঠে। ভারতের রাজনীতি লইয়া তাঁহারা গোপন খেলায় উৎসাহিত —ইহা দেশের মানুষ মোটামুটি বুঝিয়া লইয়াছে। কেন? এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? ভারতকে খণ্ড খণ্ড করাই শুধু নয়, এক শ্রেণীর ভারতীয়কে ধর্ম্মান্তরিত করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও এই খেলার অন্যতম বাজি।

## ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের বর্ত্তমান নীতি

ইংরেজ আমলে যে সব নগ্ন অপকৌশল ও জুলুমবাজীর আশ্রয় লইয়া ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইত; স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রে সেই সব পন্থা খোলাখুলি ভাবে অবলম্বনের দুঃসাহস মিশনারীদের ততটা নাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া তাঁহাদের দৌরাত্ম্য একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, একথা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তাঁহাদের ধৃষ্টতার কোন কোন সংবাদ এখনো মাঝে মাঝে আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানিতে পারি। কেবল মাইকেল স্কটকে নয়, প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্য-কলাপের জন্য ভারত সরকার আরো কোন কোন বৈদেশিক মিশনারীকে এদেশ হইতে বহিষ্কারে বাধ্য করিয়াছেন। যেমন, ইং ১৯৫৫ সালে বৃটিশ মিশনারী Howell Lloyd কে ভারত হইতে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু, এই ধূর্ত্ত ও দুষ্টবুদ্ধি পাদ্রীপুঙ্গব পুনঃ মিথ্যা পাশপোর্ট সংগ্রহ করিয়া আসল নাম ভাঙ্গাইয়া দ্বিতীয় বার ভারতে আসিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি ভস্মীভূত করণ এবং ছয়জন হরিজন বালকের শিখা কর্ত্তনপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করণের অপরাধে একদা দুইজন মিশনারী কিষাণগঞ্জ আদালতে অভিযুক্ত হন। যৌন সম্পর্কিত প্রণয় এবং প্রণয়জাতীয় বিবাহ ও ধর্ম্মান্তরের কাহিনী এখনো অজস্র শুনা যায়। নিরাশ্রয় ও অনাথ শিশুগণকে আশ্রয়দানপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা খৃষ্টীয় সমাজের দলবৃদ্ধির সুযোগ পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদার টেরিজা ভ্রূণহত্যা না করিয়া সন্তানগুলিকে তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিতে বলেন। ইহার ভিতরে মানবতার অপেক্ষা খৃষ্টানের সংখ্যাবৃদ্ধির গরজটাই কি অধিক নয়?—অগণিত মানুষের প্রশ্ন। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, এই মিশনারী প্রচারিকাকে ভারতবর্ষে 'হিরো' বানাইবার জন্যই বিশ্বপুরস্কারে অভিনন্দিত করা হইয়াছে।

এই সকল বিতর্কে আমরা জড়িত নহি। আমরা শুধু এই কথা বলিব যে, হিন্দুর ক্ষয়সাধনের পথ মিশনারীদের পক্ষে পূর্ব্ববৎ উন্মুক্তই আছে। তৎসহ আরো দুইটি অপূর্ব্ব সুযোগ তাঁহারা পাইয়াছেন—একটি হইল ভারতের "ধর্ম্মনিরপেক্ষ নীতি" এবং অপরটি হইল ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী, দারিদ্র্য ও অন্নক্লেশ।

এ বিষয়ে পূর্ব্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে। আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর মিশনারীরা ক্ষণিকের জন্য থমকিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কি হয় ভাবিয়া। কিন্তু, ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানে যে দিন ধর্ম্ম-নিরপেক্ষনীতি গৃহীত হইল, সে দিন আনন্দে তাঁহারা নৃত্য করিয়া উঠিলেন। সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘের ভারতীয় সভ্য Father J. D. Suza নিউইয়র্কে তাঁহার ভাষণে (মার্চ, ১৯৫০) বলেন—"Under the new secular regime in India there is a wider possibility for Missionary works than before." অমনি বিদেশ হইতে অত্যুৎসাহী মিশনারীদের প্রবল স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল। ভারতে তাঁহাদের উৎসাহ এতই বাড়িয়া গেল যে, এক সময় ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (তখন ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু) পর্য্যন্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"বিদেশীয় মিশনারীরা ভারতে আসিয়া ভারতবাসীদের সঙ্গে যদি ধর্ম্মের প্রতিযোগিতা চালান এবং তাহাদের বলেন আমার ধর্ম্ম ভাল তোমার ধর্ম্ম বাজে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মের প্রশ্ন হইবে না, তাহা হইবে আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন এবং ইহা ভারত সরকার সহ্য করিতে পারেন না। * * ভারতীয় খৃষ্টানরা তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলিতে পারেন। তবে ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলার ব্যাপারটিকে আইন ও শৃঙ্খলার দিক হইতে দেখিতে হইবে।"

মিশনারীদের নানাবিধ প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যকলাপে বিব্রত হইয়া মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীবি, এস, নিয়োগীর নেতৃত্বে এক কমিশন নিয়োগ করেন। ধর্ম্মান্তর করণই যে মিশনারীদের যাবতীয় শিক্ষা ও সেবামূলক কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, নিয়োগী কমিশন সে বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—"All the philanthropic acts of the missionaries are simply a mask for carrying on proselytising activities, sometimes by intimidating and sometimes by tempting the simple folk. At the root of these activities is their ambition to carve out a seperate Christian State for themselves on the strength of their numbers. They are spending countless crores of rupees for that single purpose."

অর্থাৎ, মিশনারীদের যাবতীয় লোকসেবা ধর্ম্মান্তর কর্ম্মের কেবল একটা মুখোস। সরল মানুষদের কখনো ভয় দেখাইয়া, কখনো প্রলোভনের দ্বারা তাঁহারা একাজ করিতেছেন। সংখ্যার জোরে তাঁহাদের জন্য এক স্বতন্ত্র খৃষ্টান রাজ্য খণ্ডিত করিয়া লওয়ার উচ্চাশাই রহিয়াছে এই সকল কার্য্যের মূলে। এজন্য তাঁহারা অসংখ্য কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন।

পরবর্তী রেগে কমিশনের অভিমতও তাহাই। ইহা নিয়া ভারতীয় সংসদে আলোচনাও শুরু হইয়াছিল। কিন্তু, আলোচনার দ্বিতীয় দিবসে কোন অজ্ঞাত কারণে পণ্ডিত নেহরুজী ঐ আলোচনা সহসা বন্ধ করিয়া দেন। ধর্ম্মনিরপেক্ষ নীতি ভারতরাষ্ট্রকে কতখানি অসহায় করিয়াছে, এই দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। কিন্তু, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীজী অকুণ্ঠ কণ্ঠে মিশনারীদের কার্যকলাপের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এক সময় তিনি মিশনারীদিগকে "Messengers of beef and beer bottle" অর্থাৎ, "গোমাংস ও মদিরার বার্ত্তাবহ দূত" বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার হরিজন পত্রিকায় (ইং ৬।১।৩৭) প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারত হইতে হিন্দুত্বের সমূল উচ্ছেদ এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাই যে মিশনারীদের কর্ম্মতৎপরতার প্রধান

উদ্দেশ্য সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকিলে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মান্তর বন্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষাই আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছিলেন "The object of christian missionary effort in india is to up-root Hinduism from the very foundation and replace it by another faith...if I had the power and could legislate, I should certainly stop all proselytising."

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক্ষণে ভারতীয়দেরই হাতে। কিন্তু, গান্ধীজীর মহতী ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভারতে খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম্মান্তর আন্দোলন বন্ধ তো হয়-ই নাই, বরং, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় সংবিধানের নিরাপদ আশ্রয়ে উহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ছোট্ট একটি মাত্র দৃষ্টান্ত ধরুন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যে খৃষ্টানের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩৮ জন, আর ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৩০, ৫০০। হিন্দু উপজাতীয়দিগকে ব্যাপক ধর্ম্মান্তরিত করিতেছেন মিশনারী প্রচারকেরা (সংবাদ—যুগান্তর, বাং ২৮।৪।৯৩)। বস্তুতঃ, এখন ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারে মিশনারীদের মৌলিক অধিকার। তৎসহ জনসেবার মুখোসটিকে তাঁহারা শক্ত করিয়া আঁটিয়া নিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে এই দুইটিই হইল তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র। কেহ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিলেই তাঁহারা দেশময় যে কত জনহিতকর কার্য্য করিতেছেন, তাহার নজির দেখান, কিম্বা রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে বলিয়া আর্ত্তনাদ শুরু করিয়া দেন।

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ গুপ্ত মধ্যপ্রদেশ বিধান সভায় বৈদেশিক রাষ্ট্রের যাজকগণ কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌম ভারতের অভ্যন্তরে ধর্মান্তর করণ অভিযানের বিরুদ্ধে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহা

ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরোধী, বিভেদাত্মক এবং সংখ্যালঘু খৃষ্টানগণের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট—এই সকল যুক্তি দেখাইরা ভারত ও বহির্ভারতের মিশনারীদের পক্ষ হইতে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হয়। এমন কি, কোনও ক্যাথলিক খৃষ্টান তাঁহার পত্রিকার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করিয়া লেখেন যে, যদি বিলটি আইনে পরিণত করার চেষ্টা হয় তবে দেশে ভীষণ দাঙ্গা শুরু হইবে। বিলটি চাপা পড়ে। জনতা সরকারের আমলে শ্রীওম্‌প্রকাশ ত্যাগীর প্রস্তাবিত 'ধর্ম্মীয় স্ব.ধীনতা' বিলটি সংসদে উঠিবার আগেই প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

তারপর ভারতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্গতির কথা। পরাধীনতার যুগে বিদেশীর শাসন ও শোষণে ভারতবর্ষ তো দরিদ্রই ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরও সেই দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে আমরা মুক্তি পাই নাই। দারিদ্র্য ও বেকারী আজ ভারতবাসী মাত্রেরই এক সাধারণ সমস্যা। ক্রমাগত বন্যা, অনাবৃষ্টি ও অজন্মায় ভারতে আজ নিদারুণ অন্নাভাব। ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, কণ্ঠে কণ্ঠে অন্নবস্ত্রের জন্য প্রাণভেদী হাহাকার, কত পরিবার ছিন্নমূল, কত শিশু নিরাশ্রয়, কত বিধবা অনাথা। লক্ষ লক্ষ মানুষের শীর্ণমুখের আজ একটি মাত্রই ভাষা, তাহা হইল ক্ষুধা—যে ক্ষুধা ডাকিয়া আনে মৃত্যুবিভীষিকা। ভারতের এই খাদ্যসমস্যা ও অর্থনৈতিক দুর্গতি দূরীকরণে রাষ্ট্রনেতৃগণ প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু, সমস্যা এতই ব্যাপক, গভীর ও জটিল যে সহজে তাহার নিরাকরণ সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। বৈদেশিক মিশনারীরা অন্নক্লিষ্ট ও দারিদ্র্যপীড়িত ভারতের অসহায়তার সুযোগ পূর্ব্বেও গ্রহণ করিতেন, এখন পূর্ণ মাত্রায় সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বিদেশ হইতে অধিক সংখ্যায় কর্মী ও প্রচারকের আমদানী হইতেছে এবং কোটী কোটী টাকা আসিতেছে। চাল, আটা, ঘি, দুধ, ঔষধপথ্যাদি লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দরিদ্র ও অনুন্নত জনগণের মধ্যে তথা

উপজাতীয় পল্লী এবং উদ্বাস্তু কলোনীগুলির ভিতরে তাঁহারা অবাধে প্রবেশ করিতেছেন। এই অনুপ্রবেশের পরের ঘটনার পুনরুল্লেখ না করিলেও চলে। আমরা অসহায়ের ন্যায় সব দেখিতেছি। কিন্তু, দেখিয়া শুনিয়াও উদাসীন ও প্রতিকারবিমুখ।

**ভারত সরকারের উচিত—দেশের অন্ধ, আতুর, দরিদ্র, অসহায়, অনুন্নত, অনাথ, উদ্বাস্তু, নিরন্ন, পঙ্গু প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর আর্ত্ত প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে স্বহস্তে গ্রহণ করা এবং বৈদেশিক মিশনারীদিগকে অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিতে বলা এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত যাবতীয় শিক্ষা, সেবা, কৃষি, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লওয়া।** ব্রহ্ম সরকার পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মকে জাতীয় ধর্ম্মরূপে ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দেশ হইতে বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারকগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদী এবং অকুণ্ঠ মানবসেবাব্রতী রামকৃষ্ণ মিশনের শাখায়ও দেখি আংশিক কোপ পড়িয়াছে। মিশর, আরব, আফগানিস্থান প্রভৃতি মুস্লিম রাষ্ট্রে মুসলমানগণকে ধর্ম্মান্তর করিলে দণ্ড অতি সুকঠিন। পাকিস্থান ঐশ্লামিক রাষ্ট্র বলিয়া বিঘোষিত হওয়ায় সেখানে মিশনারীদের ধর্ম্মান্তরমূলক কার্য্য পরিচালনের সুযোগ অতি কম। সেখানে ধর্ম্মান্তরের উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার প্রচারকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং মিশনারী স্কুলে অখৃষ্টানদিগকে বাইবেল পড়ানো বন্ধ হইয়াছে। সেখানকার মুস্লিম জনসাধারণও স্বধর্ম ও স্বজাতি সম্বন্ধে এতই সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ যে, কোনও বৈদেশিক ধর্মযাজক ব্যাপক ধর্মান্তর কার্য্য আরম্ভ করিলে ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ জনতার হস্তে তাঁহার প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা। অথচ, দারিদ্র্য ও বেকারী সেখানেও আছে। ভারতের দক্ষিণে সিংহল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। বৌদ্ধধর্ম সেখানকার জাতীয় ধর্ম। তথায় মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত যাবতীয় স্কুল ও কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লওয়া

হইয়াছে এবং কোন বিদেশী ধর্মপ্রচারককেই সহসা প্রবেশানুমতি দেওয়া হয় না, অনুমতি পাইলেও সিংহলে প্রবেশ ও অবস্থানের জন্য তাঁহাদিগকে ট্যাক্স দিতে হয়। ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র নেপালও মিশনারীদের সম্বন্ধে সচেতন। কোনও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রই তাহার অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অনুন্নত ও দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে বিদেশীদের ধর্মপ্রচারের ও ধর্মান্তর করণের অবাধ সুযোগ বরদাস্ত করে না। কিন্তু, পরিতাপের বিষয়—ভারতরাষ্ট্রে ইহার ব্যতিক্রম। ভারতের এই আত্মনাশা এবং তথাকথিত উদার ও নিরপেক্ষ নীতির অবসান ঘটিবে কবে?

# মিশনারীদের প্রয়োজন কোথায় ? ভারতে ? না, তাঁহাদের নিজ দেশে ?

"From all over the world come reports of the break down and disintegration of the family. Practically every where there are soaring divorce rates, desertions, infidelity, illegitimacy and, in particular, juvenile misbehavior. No longer do common interests unite family members, nor do moral standards restrain them. Each member often goes his own way with little regard for the feelings and welfare of others in family."

কথাগুলি কাহাদের ? এই রূঢ় সত্যের মুক্ত স্বীকৃতি তাঁহাদেরই কণ্ঠের যাঁহারা আমাদের ভারতবর্ষের মানুষকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ দেখাইতে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়া দলে দলে এই দেশে আসিয়াছেন এবং আসিতেছেন, আর কোটি কোটি টাকার বেসাতি নিয়া এই দেশের নগরে, গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের নিজেদের খৃষ্টানী দুনিয়ার নৈতিক, ধার্ম্মিক, সামাজিক, পারিবারিক দুর্দ্দশার নিষ্করুণ চিত্রটা একবার দেখিতেছেন কি ?

উপরের উদ্ধৃতিটি Awake নামক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার— Oct. 8, 1965. পত্রিকাটি পরিচালন করেন এক খৃষ্টীয় মিশন। খৃষ্টীয় সমাজের অধঃপতন সম্বন্ধে Awake সরল স্বীকৃতিতে বলিতেছেন—"সর্ব্বত্র পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ধরেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ, পতি-পত্নীর বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস, ধর্ম্মে অবিশ্বাস, বিজন্মত্ব এবং তরুণ সমাজের যৌন ব্যভিচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সাধারণ স্বার্থ

পরিবারের সভ্যগণকে আর ঐক্যবন্ধনে ধরে রাখছে না। প্রত্যেক সভ্যই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সুখ-দুঃখ ও মঙ্গলের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা না দেখিয়ে নিজ নিজ খুসী মত আপন পথে চলেছে।"

এই পত্রিকা পরিসংখ্যান সহ আরো যাহা আলোচনা করেন তাহাতে এই সত্যই প্রকটিত যে, পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টধর্মের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। বস্তুবাদ, ভোগবাদ, নাস্তিকতা, অনাচার, ব্যভিচার, নরহত্যাদি বহুবিধ পাপ ক্রমবর্দ্ধমান। বাইবেলের পবিত্র অনুশাসনকে সগৌরবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া এই স্বেচ্ছাচার অবাধে চলিয়াছে। সে দেশের মহামান্য ধর্ম্মপিতারা এই সর্ব্বনাশ ঠেকাইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের পায়ের তলার মাটি এমন ভাবে সরিয়া যাইতেছে যে, **Awake** আশঙ্কা করিতেছেন যেন খৃষ্টীয় জগৎ অন্তিম পরিণামের দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী—"কিন্তু জেনো, শেষ কালে বিষম সময় উপস্থিত হবে। কেন না, মানুষেরা আত্মপ্রিয়, অর্থপ্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্ম্মনিন্দক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন; অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, সদ্‌বিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, ঈশ্বরপ্রিয় নয় বরং বিলাসপ্রিয় হবে।(*) বাইবেলের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়া **Awake** বলিতেছেন—"**These are the very conditions being experienced.**" অর্থাৎ, বর্ত্তমানে শেষের দিনের সেই বিষম লক্ষণ-গুলিই অনুভূত হইতেছে। ক্যাথলিক জগতের সুবিখ্যাত এবং অশেষ শ্রদ্ধাভাজন সাধু ম্যালাচির বহুশ্রুত ভবিষ্যদ্বাণী—"ইং ১৯৯৯ সালটাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের শেষ দিন। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে পোপের ভ্যাটিক্যান্ সহর; শেষ হয়ে যাবে সব।" এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইলে খৃষ্টধর্ম্মের পারমায়ু আর মাত্র কয় দিন?

---

(*) **( Tim : 3 : 1. 3 ) 'Men will be lovers of themselves, haughty, blasphemers, disobedient to parents..."** ইত্যাদি।

এই আলোচনা থাক্। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে ফিরিয়া আসি। Awake যে সর্ব্বনাশের আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন তাহা তথ্যভিত্তিক। কানাডা, জার্ম্মানী, আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ খৃষ্টীয় দেশের নানা প্রতিকূল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এই Awake এবং তাহা তুলিয়া ধরিয়াছেন সুস্পষ্ট ছবির মত।

## খৃষ্টানদের পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন

পারিবারিক জীবনে বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পহেলা নম্বরের সমস্যা (**number one social problem**)—বলিয়াছেন আমেরিকার **The Family Service Association** নামক সংস্থা। পারিবারিক জীবনের সঙ্কট সম্বন্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তাৎকালিক প্রেসিডেণ্ট জনসন্‌ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন—এই ভাঙ্গন ভীতিকর। **"Johnson Dicerns Crisis in Family"**— শিরোনামায় **New York Times ( 30th. July, 1965 )** পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয়—**"President Johnson declared today that family unit had collapsed among an alarming number of Americans......this fundamental unit is breaking down in all sections of society"**

প্রেসিডেণ্ট জনসনের এই অনুভবের সঙ্গে কানাডার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ **Dr. R. W. B. Jackson** এর প্রচণ্ড সাদৃশ্য বর্ত্তমান। এই বিদগ্ধ মনীষী বলেন—**"It is quite possible that by 2014, the family may disappear as a unit of society and other units based upon age-groups and interests may take its place."** **(Awake, 8 Oct, '65)**

অর্থাৎ, তাঁহার আশঙ্কা ইং ২০14 সালের ভিতরেই সামাজিক একক হিসাবে পরিবার অদৃশ্য হইবে এবং বয়োগোষ্ঠী ও স্বার্থভিত্তিক এককগুলি ঐ স্থান অধিকার করিবে। কেন এমন ঘটিতেছে ? Awake বলেন—"No longer are marriage bonds held sacred." বিবাহ-বন্ধন আর পবিত্র বস্তুরূপে বিবেচিত হইতেছে না। কি ভাবে পরিবার ভাঙ্গিতেছে তাহার নজির দেখাইয়াছেন Awake.

অবশ্য Awake এর দেওয়া পরিসংখ্যানগুলি অনেক পুরাণো হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহা হইতে অবস্থার গতিটা আঁচ করা যাইবে। আমেরিকার তাৎকালিক বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বৎসরে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। অর্থাৎ, প্রতি মিনিটে একটি। পোল্যাণ্ডে এক কালে বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িক ছিল না। কিন্তু ১৯৫০ সালে ১১ হাজার এবং চৌদ্দ পনর বৎসরের মুখে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে ২১ হাজার। এখন কত ? জানা নাই।

## ধর্ম্মে অনাস্থা ও যৌনাচার

খৃষ্টধর্ম্মে অনাস্থা এবং বিবাহপূর্ব্ব যৌন সম্পর্ক পাশ্চাত্যে একদা দুঃখজনক ব্যাপার বলিয়া ধিক্কৃত হইত। আর এখন ? এ সব জল-ভাত। নিউ ইয়র্কের সুবিজ্ঞ সমাজতত্ত্ববিৎ Perry J. Gangloff বলেন—

"There has been a real change in moral behavior. It is our opinion that infidelity is now taken as a matter of course". অর্থাৎ, তাঁহার সমীক্ষায় নৈতিক আচরণে সত্যই একটা মৌলিক বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ধর্ম্মে অবিশ্বাস এখন আর কোন ব্যাপারই নয়। British Medical Association-এর সঙ্গে সম্পর্কিত কোন এক সংস্থার বিবরণে প্রকাশ—যুবক-

যুবতীর অবাধ যৌন সংসর্গ সে দেশে একটা চল্‌তি ব্যসন। এই নির্ব্বাধ ও নীতিহীন যৌন বিক্রিয়ার ফলাফল তো ধামাচাপা দিয়া রাখা যায় না। অবৈধ সন্তান-সন্ততির জন্মহার নগ্নরূপেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পুরাতন পরিসংখ্যান মতে একমাত্র লণ্ডন সহরেই ১৯৬২ সালে কানীন সন্তানের সংখ্যা ছিল ৮,৪৩৫। প্রতি সাতটির ভিতরে অবৈধ সন্তান একটি। **Awake** এর তাৎকালিক প্রতিবেদনে আরো প্রকাশ—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অনূঢ়া কন্যার গর্ভে প্রতি বৎসর গড়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার শিশুর জন্ম হয়। এই সংখ্যা ১৯৪০ সালের তিনগুণ এবং ১৯৫০ সালের দ্বিগুণ। এখনকার পরিস্থিতি কেমন ? ওয়াশিংটন হইতে আগত এক প্রবাসী ভক্ত বলেন—"ওদের আর কোন লজ্জা নেই। সন্তানের জননী অবলীলাক্রমে পরিচয় দিতে পারে, তার কোন্ সন্তানটির জন্ম কার ঔরসে।"

**Awake** ল্যাটিন আমেরিকার যে অঙ্কের কথা বলেন তা অধিকতর চমকপ্রদ। **Venezuela** থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদের ভিত্তিতে উক্ত পত্রিকাটি বলেন—তথাকার শতকরা ৪৯টি শিশু অবিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত। ১৯৬৫ সালের বিবরণ মতে, তৎকালে অষ্ট্রেলিয়ায় গর্ভিণী কুমারীর সংখ্যা কুড়ি বৎসরের হারের অপেক্ষা শতকরা ১৩৫ ভাগ বৃদ্ধিপর। বৃটেনে একুশ বৎসর বয়সের নীচে যে সকল জননীর সন্তান হয়, তার প্রতি তিনটির মধ্যে দুটির ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা অন্তঃসত্ত্বা ছিল। আমেরিকায় ঐ হার প্রতি পাঁচটির ভিতরে চারিটি বা ততোধিক। অনেক নারী-পুরুষতো বিবাহই করে না, অথচ সন্তান-সন্ততির পিতা-মাতা হয়। জিজ্ঞাসার উত্তরে কেহ কেহ না কি সাফ্ বলে—"আমার ঠাকুরদাদা বিয়ে করে নি, বাবা বিয়ে করে নি, "আমিও বিয়ে করিনি।"

**Pennslyvania** একটি ছোট্ট সহর। এই সহরের জনৈকা তরুণীর উক্তি—"I don't think people are shocked by much of anything around here any more. The kids who don't get pregnant, don't get married. It's accepted." ("Awake, 8 oct, '65)"

জার্মানীর পরিস্থিতি কীরূপ? তরুণ সমাজের যৌন অধোগতির প্রকৃতি নির্দ্ধারণ এবং সেই নৈতিক সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন-কল্পে এক সময়ে ৪৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্বলিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহূত হয়। তাহাতে জার্ম্মাণ প্রতিনিধি বলেন—"The problem we have to tackle is that, 70 percent of our marriages are now due to pregnancy." (Awake, 8Oct, '65) তাঁহার মতে যৌন পাপ ছাড়াও কোন কোন দেশের শতকরা ৫০টি বড় রকমের অপরাধই অনুষ্ঠিত হয় একুশ বৎসর বয়সের নীচের ছেলেদের দ্বারা। তাঁহার ভাষায়—"But gross misbehavior of youths is not limited to sexual immorality. This is evident by fact that about 50 percent of all serious crimes in some countries are committed by youth under twenty-one years of age." (Awake, 8 Oct, '65)

**New Jersey** হইতে এক ভক্ত জানাইতেছেন—"কয়েক দিন আগে রেডিওতে খবর শুনলাম। নিউ জারসি ষ্টেটে গত ১৯৭৯ সালে ১৯ হাজার অবৈধ সন্তান জন্মেছে। ১৯৭৬ সালের গণনায় এই সহরের লোকসংখ্যা মাত্র ৭৪ লক্ষ।" চিত্রটি কি ভয়াবহ!

## কালোবাজারী, নরহত্যাদি অপরাধপ্রবণতা

কেবল যৌন বিক্রিয়া নয়, কালোবাজারী, নরহত্যাদি অপরাধ-প্রবণতাও পশ্চিম দেশে তুঙ্গে। ১৩৭৩ সালের ১০ই ভাদ্রের আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশ—"বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে যতগুলি আন্তর্জাতিক যুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ে তাতে সর্ব্বসমেত ৫ লক্ষ ৩০ হাজার আমেরিকান মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু, দেশের ভিতরে পরস্পর মারামারিতে গোলাগুলি ছুঁড়ে মারা যায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ। প্রতি বৎসর এই ধরণের মৃত্যুর সংখ্যা ১৭ হাজ'র, প্রতিদিন ৫০। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি ঘণ্টায় খুন হয় দুটি ক'রে তাজা প্রাণ।"

অর্থনৈতিক দুর্নীতির বহরও কি কম ? আনন্দ বাজার পত্রিকা বলেন—"দলবদ্ধ অপরাধমূলক কার্য্য চালিয়ে 'এক শ্রেণীর আমেরিকান্‌দের বার্ষিক আয় ৫ হাজার কোটি ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র সামরিক বাজেটেও এত অর্থ বরাদ্দ করা হয় না, সেই দেশের বড় বড় মোটর কারখানাগুলির সম্মিলিত মুনাফাও এত নয়।" আরো জানা যায়—ইং ১৯৫০ সালের তুলনায় আমেরিকায় অপরাধের সংখ্যা শতকরা ৯৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বে-পরোয়া ভোগোন্মত্ততার জন্য পাগলের সংখ্যা সে দেশেই না কি সর্ব্বাধিক।

## পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম্মহীনতা

মিশনারী পত্রিকা **Awake** পাশ্চাত্যের ধর্ম্মহীনতার চিত্রটিও তথ্যাদি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মহীনতাই সকল অনর্থের মূল। পশ্চিমের অধিকাংশ মানুষ আজ আর ধর্ম্ম মানিয়া চলিতেছে না। তাহাদের কাছে বাইবেলের উপদেশ পুরোণোকেলে এবং অনাবশ্যক। ঈশ্বরে অবিশ্বাস, বাইবেলে অবিশ্বাস, চার্চ্চে অবিশ্বাস ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহাদের ভিতরে কথঞ্চিত ধর্ম্মবিশ্বাস আছে, তাহাদের ব্যাবহারিক

জীবনে ঈশ্বর, বাইবেল বা চার্চ্চের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব নাই। জীবিকার জন্য তাহারা উদ্‌ভ্রান্তবৎ ছুটিয়া বেড়ায়, যাহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক থাকে না। রবিবারের গীর্জ্জাঘরগুলি অর্দ্ধেকও পূর্ণ হয় না। প্রোটেষ্টাণ্ট ইংলণ্ড থেকে ক্যাথলিক ফ্রান্স ও ইটালী পর্য্যন্ত নূতন ও পুরাতন চার্চ্চগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। মার্কিন ধর্ম্মযাজক Norman Vincent Peale এর মন্তব্য—"Going across Protestant England to Catholic France and Italy, one becomes aware that Churches, especially old ones. have become more like historical monuments, you might say, rather than vital spiritual influences." ( Awake, 8 Oct, '65 )

বস্তুতঃ ঐ গীর্জ্জাগুলি আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাণবন্ত ক্ষেত্ররূপে আর বিরাজ করিতেছে না। প্রাচীন গীর্জ্জাগুলি ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায় কেবল নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। উত্তর আমেরিকার ধর্ম্মীয় প্রভাবের ক্ষীণতা এত বেশী যে, সেখানে উপযুক্ত সংখ্যক ধর্ম্মযাজক পাওয়া যাইতেছে না। ধর্ম্মহীনতার সম্বন্ধে Awake বলেন—"The majority of persons ignore the Bible considering its cousel out of date." আর এক প্রবন্ধে বলেন—"Loss of faith is growing—loss of faith in God. loss of faith in Bible, loss of faith in Churches. Though many still profess belief in God and Bible and even belong to a Church, their faith in minimal and hardly effects their daiy life." দক্ষিণ আফ্রিকার এক ধর্ম্মনিষ্ঠের উক্তি—"The empty Church is the evil symptom of degeneration in our time." ( Awake, 8 Oct, '65) চার্চ্চের উপাসনায় লোক হয় না, এটাই খারাপ অধঃপতনের বড় লক্ষণ। N. V. Peale বলেন—"It appears

that Church-going and religious practice are decline." (Awake, 8 Oct., '65)

আমাদের লণ্ডন শাখার প্রতিনিধির প্রদত্ত বিবরণ হইতে এই একই তথ্যের অধিকতর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি এক চিঠিতে (5. 5. 81) লিখিয়াছেন—"It is a common belief among Hindus in India that Christians are regular Church-goers. Nothing can be further from the truth. In Rome for example, which is the heart of Roman Catholicism, there is an almost equal division between Christians and Communists. In England and the U.S.A., there is so drastic reduction among Church-goers that both for economical reasons and being realistic the size of many Churches have been reduced and many Churches have become empty.

About these redundant Churches, the 'Times' of London published an article just before Christmas under the caption 'Bells Toll for Churches". The implication is that many Churches have now become 'dead'. This is an indication of how much interest Christians have in their religion."

অর্থাৎ, ভারতের হিন্দুরা মনে করে খ্রীষ্টানরা সকলেই বুঝি নিয়মিত গীর্জ্জায় যাইতে অভ্যস্ত। ইহা হইতে সত্যের অপলাপ আর কিছু হইতে পারে না। রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মমতের প্রাণকেন্দ্র রোমে খ্রীষ্টান ও কম্যুনিষ্ট প্রায় সমান সমান। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গীর্জ্জায় উপাসনাকারীদের সংখ্যা এমন প্রচণ্ড ভাবে কমিয়া যাইতেছে যে, খরচ চালাইতে না পারিয়া এবং অনাবশ্যক বোধে বহু গীর্জ্জার

আয়তন ভাঙ্গিয়া ছোট করা হইতেছে এবং বহু গীর্জ্জা বস্তুতঃ শূন্য। গীর্জ্জাগুলির মরণ ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, লিখিয়াছেন লণ্ডনের Times পত্রিকা—"Bells toll for Churches" শিরোনামার এক সংবাদে। সঙ্ঘের উক্ত প্রতিনিধি অনেক গীর্জ্জার কাছেই মদের দোকান দেখিয়াছেন এবং রবিবারের প্রার্থনার পরই বহু ভক্ত পানার্থে ঢুকিয়া পড়ে ঐ সুরালয়ে। তাঁহার ভাষায়—"In fact, near to every church is a liquer shop to which many christians go after their religious services on Sunday." বুঝিতে বাকী থাকে না, ভক্তদের তৃষ্ণা আধ্যাত্মিকতার অপেক্ষা লিকারের উপরই অনেক বেশী।

## বহু গীর্জ্জা বিক্রয় হইয়া যাইতেছে

অকেজো গীর্জ্জাগুলির শেষ দশা কি? উত্তরে সঙ্ঘ-প্রতিনিধি লিখিয়াছেন—"ঐ সব গীর্জ্জার কতক গুদাম ঘর রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, কতক খালি পড়ে আছে, কিছু সংখ্যক বিক্রি ক'রে দেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু গীর্জ্জা কিনে নিয়েছে প্রবাসী হিন্দুরাই—বানিয়েছে মন্দির, না হয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।" তাঁহার সমগ্র বিবৃতিটি এই রূপ ঃ—"Many of these redundant Churches are used for storages or simply remain empty. Some of them that are offered for sale are bought by Hindus and converted into Temples. In Coventry (England) a Church Hall with beautiful oriental designs has been converted into a Krishna Temple and in London the Bhartiya Vidya Bhavan has converted a Church into a Temple-cum-hall. In Brixton where there were racial riots recently, the Caribbean

Hindu Society has converted a Church Hall into a Temple-cum-hall and in Coventry a Church has been converted into a Temple. Similar conversions have been done by the Hindu Centre and the East London Hindu Centre. Hindus from Sri Lanka and South India have converted a Jewish Synagogue in London into a Hindu Temple with plans to develope it into South Indian styles. These are only just few examples at random. A careful study will show that many more places have been converted by Hindus and they are quite keen to buy others if they are available and they have the means,"

অর্থাৎ "কভেন্ট্রি সহরে একটি সুন্দর গীর্জ্জা কৃষ্ণমন্দিরে রূপান্তরিত। ভারতীয় বিদ্যাভবনের মন্দির ও সভাগৃহও একটি কিনে নেওয়া গীর্জ্জার রূপান্তর। ব্রিক্সটন্ এলাকায় যেখানে সম্প্রতি শ্বেত ও কৃষ্ণকায়দের বর্ণবিদ্বেষজাত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেল, সেখানেও কারিবিয়ান্ হিন্দুরা একটি গীর্জ্জা কিনে নিয়ে মন্দির বানিয়েছেন। হিন্দু সেণ্টার এবং ইষ্ট লণ্ডন হিন্দু সেণ্টারও এইরূপে দুটি গীর্জ্জার রূপান্তর ঘটিয়েছেন। শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুরা লণ্ডন সহরে ইহুদীদের একটি উপাসনা মন্দির ( synagoue ) কিনে নিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পশৈলীর অনুভাবে সেটিকে দেবমন্দিরে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। হিন্দুরা আরো পেলে আরো কিনতে আগ্রহী, যদি সুবিধা দরে পাওয়া যায়।"

সঙ্ঘের কানাডাস্থিত প্রতিনিধি টরেণ্টো সহরে একটি ছোট গীর্জ্জা ঘর আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য কিনিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু, দরে বনিবনা হয় না। পরে অন্য একটি ত্রিতল বাড়ী কেনা হয়।

কিন্তু, ঐ সহরেরই হিন্দু প্রার্থনা সমাজ এবং বৈষ্ণব ভক্ত ইস্‌কন্ সাধুদের আশ্রম দুইটি গীর্জ্জাঘর কিনিয়া লইয়া তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। এরূপ তথ্য আমাদের জানা আছে যে, পশ্চিম লণ্ডনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখাশ্রমের অনতিদূরে একটি গীর্জ্জাকে ভাঙ্গিয়া তাহার আয়তন সিকি করা হইয়াছে এবং ভাঙ্গা অংশে ফ্ল্যাট, বাড়ী তুলিয়া গীর্জ্জার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভাড়া খাটানো হইতেছে।

সঙ্ঘের আমেরিকার এক প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশ—New Jersey state এ Jersey city সহরে ( নিউ ইয়র্কের কাছে ) বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান Kalibari Incorporated একটা ব্যাপ্‌টিষ্ট চার্চ্চ কিনিয়া লইয়াছে নগদ ৩৫ হাজার ডলার মূল্যে। সেই চার্চ্চে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে দিল্লীর কালী মন্দিরের মত। ভারত হইতে পাথরের প্রতিমা নিয়া আনুষ্ঠানিক পূজা হইয়াছে ১৯৮৯ সালে। আবার আমেরিকার এক বিশিষ্ট দৈনিক The Star Ledger এর সংবাদে (19th. Oct. 1981 ) প্রকাশ,—"Plans are being made to renovate St. Joseph's Church, a national landmark at 221 W. Market St. and build medical offices, a restaurant and new space for a day-care centre at the site." অর্থাৎ, St. Joseph's Church নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবে। উপাসনা মন্দিরে তৈয়ারী হইতেছে রেষ্টুরাণ্ট, যার সঙ্গে liquor licenseও থাকিবে। আর এক সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, New Wark সহরের বহু পুরাতন উপাসনা স্থান st. James church-কে ধূলিসাৎ করিয়া সেখানে তৈয়ারী করা হইয়াছে Parking Lot, গাড়ী দাঁড়াইবার জায়গা নাই বলিয়া। ঐ সূত্রের আর এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, ও-দেশের বেশীর ভাগ গীর্জ্জাতেই সপ্তাহে দু'এক দিন Bingo নামে এক রকমের জুয়া খেলা হয়—টাকা রোজগারের জন্য। তবেই ভাবুন—গীর্জ্জাগুলির দুর্দ্দশা কোন্ পর্য্যায়ে উপনীত।

আজকাল ( ২৫শে ভাদ্র, ১৩৮৮ ) পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রথম হিন্দু মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে ৩৫০০ পাউণ্ড মূল্যে একটি পুরাণো গীর্জ্জা কিনিয়া নিয়া। ইউ এন আই এর প্রদত্ত তথ্যানুসারে আনন্দ বাজার পত্রিকার ১৬ই জুলাই, ১৯৮১ তারিখের খবরে প্রকাশ—"সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নির্ম্মিত ব্রিস্টল সহরের বিখ্যাত লিউইনস্ মিড্ চ্যাপেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কারণ, উপাসনায় পঞ্চাশ জন লোকও হয় না। জানালাগুলি নড়বড়ে হয়ে পড়েছে, দেওয়ালের চুন-সুরকি খসে খসে পড়ছে। গীর্জ্জার সাধারণ অবনতি ও মুদ্রাস্ফীতির জন্য চ্যাপেলটিকে ভালভাবে রক্ষা করা যাচ্ছে না—জানিয়েছেন চ্যাপেল কমিটির চেয়ারম্যান আরথার্ ব্রাউন। একটা নাচের স্কুল ওখানে ব্যালে ট্রেনিং সেণ্টার খোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।"

এই তো খৃষ্টজগতের অবস্থা! নীতিগত ভাবে বলা যায়, ভ্যাটিক্যানের গভীর তলায় আগুন তো লাগিয়াই গিয়াছে। কেবল উপর তলা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে যা বাকী। এই রকম যখন নিজেদের দেশের পরিস্থিতি, তখন খৃষ্টীয় বন্ধুরা নিজের ঘর না সামলাইয়া ভারতে ছড়াইয়া ছিটাইয়া পড়িতেছেন ধর্ম্মপ্রচার করিতে, আর তাঁহারা এই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মানুষদের দেখাইবেন মুক্তির পথ। নিজেদের দেশের মরণোন্মুখ গীর্জ্জাগুলিকে না ঠেকাইয়া ভারতের আনাচে-কানাচে লক্ষ লক্ষ টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া হাজারে হাজারে নূতন গীর্জ্জা খাড়া করিতেছেন—অবিশ্রান্ত। নিজেদের দেশের মানুষদেরই যেখানে বাইবেলে বিশ্বাস নাই, সেখানে এই দেশে লক্ষ লক্ষ বাইবেল বিতরণের মহাযজ্ঞ চলিতেছে। বুঝিতে বাকী থাকে না, আপন দেশে পাত্তা না পাইয়াই পাদ্রীপুঙ্গবেরা এই দেশে আসিতেছেন, আর খুলিয়াছেন ধর্ম্মবাণিজ্য। টাকা দিয়া, খয়রাতি বিলাইয়া, সত্য-

মিথ্যা ভাঁওতা দিয়া ধর্ম্মান্তরের বঞ্চনায় বস্তুতঃ মানুষ ক্রয়ই চলিতেছে। তৈয়ারী হইতেছে ধর্ম্মীয় ক্রীতদাস। ইহার কোন অর্থ হয়?

মিশনারী বন্ধুদের কাছে সবিনয় নিবেদন—তাঁহারা অনতিবিলম্বে নিজের দেশেই ফিরিয়া যান। আপন দেশ ও সমাজকে বাঁচান। নিজের দেশ ও সমাজ যেখানে এইরূপ অতিমাত্র বিপন্ন, সেখানে দেশ ছাড়িয়া পর দেশে আসিয়া ধর্ম্মবিতরণের প্রয়াস কি বাতুলতা ও ভণ্ডামি নয়? ইহা কি চূড়ান্ত আত্মপ্রতারণা নয়? ইহা তো সময়, শক্তি ও সম্পদের অশেষ অপব্যবহার। আর স্বদেশবাসীর প্রতি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা, বঞ্চনা ও কর্ত্তব্যহীনতা।

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনাদের জাত-ভাইরা স্বদেশে নরকে ডুবিতে বসিয়াছে—ঘোর নরক—অনন্ত নরক। অহো, কি দুঃখ! ধর্ম্ম না মানিয়া, বাইবেল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, গীর্জ্জার উপাসনায় ইস্তফা দিয়া, আর বোতল বোতল সুরা গিলিয়া এবং যৌন ব্যভিচারে মজিয়া নরকে ডুবিতে হয়—ইহা আপনাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন। তাহা জানিয়াও বিপন্ন জাত-ভাইদের পরিত্যাগ করিলেন কোন্ বিচারে? আপনাদের প্রয়োজন তো সেখানেই বেশী। ভারতবর্ষ? কোন দুশ্চিন্তা করিবেন না। ভারতের সমস্যা ভারতীয়রাই দেখিতেছে এবং দেখিবে। ভারত আবার উঠিতেছে, জাগিতেছে।

## ধর্ম্মান্তর কর্ম্মে মুসলিম মিশন

কিছুদিন যাবৎ একটা গুঞ্জন প্রায়ই কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। তৈলসমৃদ্ধ আরবীয় দেশগুলি হইতে না কি দেদার অর্থ প্রকাশ্য ও গোপন পথে ভারতে আসিতেছে, আর সেই অর্থ যাঁহাদের হাতে পড়িতেছে তাঁহারা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপক ভাবে ও বিপুল উদ্যমে আত্মসংগঠনে

লাগিয়া গিয়াছেন, আর উদ্যোগ নিয়াছেন হিন্দুদের বিশেষতঃ তপশীলী হিন্দুদের ধর্ম্মান্তর করণে।

প্রতিবেশীরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হউন, তাহা সর্ব্বদা কাম্য। ভাঙ্গা মসজিদ্ জোড়া লাগুক, নিত্য নূতন মসজিদ্ গড়িয়া উঠুক, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হউক। নূতন নূতন ফেণ্টুনে নব নব ঐশ্লামিক সংস্থা জন্মলাভ করুক, দেশ-বিদেশ হইতে ইসলামের ধর্ম্মগুরুরা আসুন এবং বক্তৃতা দিন, শ্রদ্ধেয় মৌলভী-মোল্লা মহোদয়েরা সারা রাতভর মাইকে কোরাণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা সহ ঐশ্লামিক ঐক্যের বাণী শুনান—কারো কিছু বলিবার নাই। কিন্তু, এই সকল উদ্যম নিছক ধর্ম্মনিষ্ঠা না হইয়া যদি ধর্ম্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার উগ্রতা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিবেশীদের ক্ষতির কারণ হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্তরা নিশ্চয়ই যথেষ্ট সাবধান হইবেন—সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

বিদগ্ধ ঐতিহাসিকেরা ভালই জানেন ইসলামের চরিত্র। ধর্ম্মান্তর কর্ম্মে ইসলাম বলপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত নহেন। ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমান—হিন্দু মা'র সন্তান। ভারতে প্রথম পদক্ষেপ করার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ইসলাম এই ধর্ম্মান্তর কর্ম্ম চালাইয়া যাইতেছেন। স্বাধীন ভারতেও তাহার বিরাম নাই। বিশেষতঃ ভারতের ধর্ম্মনিরপেক্ষ নীতি খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রচুর সুযোগ আনিয়া দিয়াছে এবং হিন্দুদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করিতে এই দুই সম্প্রদায়ের তৎপরতাই আজ ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্বেগের কারণ। তাই এ প্রসঙ্গেও বলিব—হিন্দু, হুঁসিয়ার!

হিন্দুদের ধর্ম্মান্তরে ঐশ্লামিক সংস্থাগুলি যে কিরূপ সক্রিয়, তার সর্ব্বাধুনিক দৃষ্টান্ত দক্ষিণ ভারতের মীনাক্ষিপুরম্ পল্লীর ঘটনা। এই পল্লীর ১২ শত হরিজনের মধ্যে ৬ শতই ইসলামে ধর্ম্মান্তরিত হয় গত ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। এই গণধর্ম্মান্তরের শোকার্ত্ত ঘটনা সমগ্র ভারতের হিন্দুমানসে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি

করিয়াছিল। রমানাথপুরম্ পল্লীতেও অনুরূপভাবে হরিজনদিগকে ইসলামে ধর্ম্মান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত বলিয়া কথিত তিরুনেলভেলী সহরের ঈশা আতুল সভার এরূপ দাবী যে, তাঁহারা ইতোমধ্যেই ৮ হাজার হরিজনকে ধর্ম্মান্তরিত করিতে সফল হইয়াছেন।

হইতে পারে—এই উক্তি কিছুটা চমক বিশেষ। কিন্তু, ভারতের ৮ কোটি হরিজনকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়া এদেশে মুসলিমের সংখ্যা ২০ কোটিতে পরিণত করিবার জোর চক্রান্ত যে চলিতেছে, তাহার প্রামাণিক দলিল আমাদের করায়ত্ত। সেই দলিলের বয়ান আর কাটা যায় না।

Arab Times পত্রিকার ৯৯শে জানুয়ারী, ৯৯৮৯ সংখ্যাটি আমরা যত্নের সঙ্গে পড়িয়াছি এবং মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াছি। মুসলিম দেশ কুবাইত হইতে প্রকাশিত উক্ত সংবাদ পত্র বলিতেছেন—"Kuwait will assist in a programme to provide aid for Muslims in Indian sub-continent, it was roported Sunday. The programme sponsored by the Islamic Cultural Centre in London is to assist over 80 Million Muslims."

এই প্রোগ্রামটা কি? ইসলামিক কাল্‌চার্যাল সেণ্টারের ডাইরেক্টর মহম্মদ আবদুল খেইর বাদাবির উক্তিতে তাহার নগ্ন স্বীকৃতি। এই ভদ্রলোক একটা Plan—অর্থাৎ মতলব বা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—একটা ভারী সুযোগ। ভারতের ৮ কোটি হরিজনকে ইসলামে টানিতে হইবে। এমন সুযোগ আর হয়তো আসিবে না। হাঁ, ভারতের জমিনটা ভাল করিয়া জরিপ করিতে হইবে। এমন লোক পাঠাইতে হইবে যে বা যাঁহারা হইবেন উর্দু জানা আরবীয়। খুব গোপনে এবং সাবধানে কাজ করিতে হইবে যেন রক্ষণশীল হিন্দুরা টের না

পায়। বাদাবীর ভাষা—"There is an opportunity to attract more than 80 million 'Harijan Hindus' who are facing attempts to force them to leave this creed and to chose other religion." ভারতের হরিজন হিন্দুরা যেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াই আছে—এই রকম ভাবখানা। সুতরাং, মানুষগুলিকে মুড়ির মোয়ার মত সত্বর লুফিয়া লইতে হইবে, তাহার জন্যই এই Plan. Arab Times-এর ভাষা—

"He ( Badawi ) suggested a plan to attract these to Islam which could then take the number of Indian Muslims to 200 million which will give them more protection. He expressed his fear that such an opportunity might not come again and proposed that the plan be urgently carried out through the European Islamic Council and to delegate one or more persons to carry out a field survey secretly and discreetly so as not to creat doubts among the Hindu circles which work to maintain its creed among its members. Badawi also suggested that such preachers should be Arab knowing Urdu and co-ordination of their work should be through the centre in London."

ভারতবর্ষে ইসলামের মতলবটা তাঁহাদের নিজেদের প্রামাণ্য উক্তি হইতেই বুঝুন। আমরা একটাও বানানো কথা বলি নাই। বলিয়াছি তাঁহাদেরই ভাষা।

এবার শুনুন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট। হরিজনদের ধর্ম্মান্তরের ব্যাপারে ভারত সরকার কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাকে স্পষ্টতঃ দায়ী করিয়াছেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ভারতে কয়েকটি মুসলমান গোষ্ঠী যে বেদম ধর্ম্মান্তর কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে তাহা তাঁহাদেরই প্ররোচনায়। আনন্দবাজার পত্রিকায় ( ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৮৮ ) শ্রীকুলদীপ নায়ার এই রিপোর্টের উপর এক প্রবন্ধ লিখেন—

"স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে বিশেষ করিয়া জামায়েত-ই-ইসলামী-হিন্দকে বিদেশ হইতে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এর সঙ্গে আছে, বিভিন্ন ইসলামী রিভাইভ্যালিষ্ট গোষ্ঠী। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, পারস্য উপসাগর ও দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় অবস্থিত মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যাহাদের বাণিজ্যিক লেনদেন আছে, সেই সব ভারতীয় ধনী মুসলমানরা আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠনগুলির হইয়া কাজ করিতেছেন। লণ্ডন-ভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র ( **Islamic Cultural Centre** ) তৈলসমৃদ্ধ আরব পারস্য উপসাগরীয় মুসলমান রাষ্ট্রগুলির আর্থিক সহায়তায় ভারতের ১২ কোটি হরিজনদের মধ্যে ৮ কোটিকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা নিয়াছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আগামী দশকের মধ্যে এই দেশের মুসলমান জনসংখ্যাকে ৮ কোটি হইতে বাড়াইয়া ২০ কোটি করিয়া তোলা।***

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাইয়াছেন, ভারতে বিদেশী মুসলমান পর্য্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছে। ইং১৯৮১ সালের প্রথম ছয় মাসেই ১২টি ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ১৯৮০ সালে সারা বৎসরে এরূপ ইজতেমার সংখ্যা ৯১। বহু বিশিষ্ট মুসলমান ভারতে বিভিন্ন ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিতে আসিতেছেন। পারস্য উপসাগরীয় ইসলামী দেশগুলি হইতে এ দেশের বিভিন্ন ইসলামিক সংস্থা, মসজিদ

ও গোষ্ঠীর কাছে অর্থ সাহায্য পাঠানো হইতেছে এবং সবটাই যে প্রকাশ্যে তাহা নয়।"

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই রিপোর্টের উপরে আনন্দবাজার পত্রিকা ( ২ রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ ) **"ধর্ম্মান্তরের পিছনে চক্রান্ত"** শীর্ষক যে বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় লিখেন তাহারই অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দিয়া এই নিবন্ধ শেষ করিতেছি।

"কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে। ধর্ম্মত্যাগের মূলে **শুধুই** কাঞ্চনমূল্য বা কিছু চাঁদির চাকতি নহে। প্রকৃত ব্যাপার একটা সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত।"

এই 'সাপ' কালসর্পরূপে চূড়ান্ত মরণ-কামড় দিবার পূর্ব্বেই ক্ষতিগ্রস্তদিগকে সজাগ, সতর্ক, সংগঠিত ও আত্মরক্ষায় প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে—হইতে হইবে হুঁসিয়ার। কারণ, এই বন্ধুরাও কম শক্তিধর নহেন। তাঁহাদের চক্রান্তজালও সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত।

# বিভেদ কি শুধু হিন্দুসমাজেই ? অন্য সমাজে নাই ?

আমরা দেখিয়াছি, সম্প্রসারণবাদী খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বার বার হিন্দুসমাজের দোষারোপ করেন, আর বলেন—তাঁহাদের সমাজে ও ধর্ম্মে যে সাম্য ও সুবিচার আছে, হিন্দুসমাজে তাহা নাই ! এই সব বলিয়াই তাঁহারা অনুন্নত হিন্দুকে দলে টানিতে চাহেন ।

হাঁ, হিন্দুসমাজে একত্র পানভোজন এবং পারস্পরিক বিবাহ সম্পর্ক লইয়া কিছু বিধি-নিষেধ আছে । কিন্তু, তাহাতে সমাজ-ব্যবহারের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে সাম্য ও সুবিচারের কোন অভাব ঘটে নাই । এই সকল বিধি-নিষেধও বর্ত্তমানে বহুলাংশে শিথিল । পক্ষান্তরে, খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে সাম্য দেখা যায় কেবল একত্র খানাপিনার ব্যাপারে । এক পংক্তিতে বসিয়া খাওয়াটাই সাম্য ও সুবিচারের চূড়ান্ত শর্ত্ত হইতে পারে কি ? ধর্ম্ম লইয়া নিজেদের ভিতরে পারস্পরিক লড়াই খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজেও প্রচুর ঘটিয়াছে—সামাজিক কৌলিন্যও আছে উভয়ের ক্ষেত্রেই । বর্ণবিদ্বেষের বীভৎসারূপ তাঁহাদের ভিতরে কোথাও কোথাও এমন প্রকট যে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয় । কেবল হিন্দুসমাজকে গালি পাড়িবার মুখরতা কেন ?

## বিভেদ—খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ও সমাজে

প্রেমময় প্রভু যিশুর উপাসকদের ভিতরে মতান্ধতা ও পরমত-অসহিষ্ণুতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ভূরি ভূরি । এ সম্বন্ধে

পুর্ব্বে এক প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ সূচনা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আরো তথ্য আসিতেছে।

খৃষ্টান ধর্ম্মজগতের সর্ব্বাধিনায়ক পোপ ক্যাথলিক মতের ধারক ও বাহক। এই মতের দুরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন লুথার, ক্যালভিন, ইরাসমাস প্রভৃতিরা। সৃষ্টি হয় প্রতিবাদী প্রোটেস্টাণ্ট্ ধর্ম্ম। আবার ইহারাও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ১৭০টি দলে পরিণত হয়। (The New Ground Work of British History—Warner & Martin, P 418) ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট্—দুই যুযুধান খৃষ্টীয় সম্প্রদায়। আবার প্রোটেস্টাণ্ট্ শাখা ও উপশাখার ভিতরেও সদ্ভাব ও সম্প্রীতি কোথায় ? কেহ কাহারো গীর্জ্জায় যায় না। এমন কি, ইহাদের ভিতরে যাঁহারা অতি রক্ষণশীল, তাঁহারা পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধেও একান্ত অনিচ্ছুক। লণ্ডনের এক ভদ্রমহিলা কথাপ্রসঙ্গে খেদ প্রকাশ করেন, তাঁহার পুত্র এক বিধর্ম্মীর কন্যা বিবাহ করিয়াছে। বিধর্ম্মী অর্থে ভিন্ন চার্চ্চভুক্ত।

ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী (১৫৩৪ খৃঃ) তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন। রাজা তাঁহার পত্নীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করিতে চাহিলে পোপ তাহাতে সম্মতি দেন না। ফলে ইংলণ্ড ও রোমের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়। রাজার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে সেই অপরাধে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত টমাস মুর ও যাজক ফিসার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। আবার অষ্টম হেনরীর কন্যা মেরী ছিলেন কট্টর ক্যাথলিক। তিনি প্রোটেস্টাণ্ট্দের সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মবিরোধীদের আগুনে পুড়াইয়া মারিতেন। এই রক্তক্ষরণের বীভৎসতার জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল 'Bloody Mary'. স্পেনের ক্যাথলিক রাজা ফিলিপের (১৫৫৮ খৃঃ) সময়ে ক্যাথলিক বিরোধীদের সায়েস্তা করার জন্য এক বিশেষ আদালত গঠিত হয়, 'যাহার নাম' 'Inquisi-

tion". বলা বাহুল্য, এই আদালত ছিল ক্যাথলিক বিরোধীদের কঠোর শাস্তির যমালয় বিশেষ। রাণী এলিজাবেথ (১৫৭০ খৃঃ) পোপের বিরোধিতা করেন রাজনৈতিক কারণে। ফলে পোপ তাঁহাকে কেবল খৃষ্টান জগৎ হইতে বহিষ্কারই করেন না, পোপের প্রশ্রয়ে তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রও হয়।

ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের আমলে রাজা-প্রজার দ্বন্দ্ব ইতিহাসখ্যাত। পার্লামেণ্ট তখন ক্যাথলিক বিরোধী পিউরিটান্ সদস্য দ্বারা পরিপুষ্ট। তাই ক্যাথলিক রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয় পার্লামেণ্টের বিচারে। রাজা দ্বিতীয় জেমস্ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ফরাসী দেশে পলায়ন করেন। প্রথম চার্লসের সময়েই ইংলণ্ড ও স্কট্ল্যাণ্ডের ভিতরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ The Bishops' War (1638) সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে স্কট্রা বুকের রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিল যে, 'ক্যাথলিক' ধর্ম্ম তাহাদের দেশে চাপাইতে দেওয়া হইবে না।

এই ধর্ম্মীয় দ্বন্দ্বের অবসান আজিও কি ঘটিয়াছে? ইংলণ্ডে কোনও রোমান্ ক্যাথলিক্ প্রধান মন্ত্রী হইতে পারেন না। ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরু পোপ ভারতে আসিয়াছেন একাধিক বার, ক্যাথলিক ষ্টেট্ দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড পরিদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট্ ষ্টেট্ ইংলণ্ডের দরজা তাঁহার জন্য বন্ধ। এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় লড়াই ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতার চিত্রটি যুগান্তরের (২২শে বৈশাখ, ১৩৮৮) এক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে প্রকাশ পাইয়াছে—

"উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে সংখ্যালঘু রোমান্ ক্যাথলিকদের অবস্থা শোচনীয়। রুজি-রোজগারের প্রায় সব পথই তাদের অবরুদ্ধ। সরকারী কিম্বা বে-সরকারী কোন উচ্চপদ পান না তাঁরা। বেকারের সংখ্যা বাড়ছে এবং রোমান্ ক্যাথলিকদের সংখ্যা কমছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের সঙ্গে সংখ্যাগুরু প্রোটেস্টাণ্টদের সম্পর্ক খুবই

খারাপ। হামেশাই চলে মারামারি। শান্তিরক্ষার অছিলায় সেখানে মোতায়েন রয়েছে বৃটিশ সৈন্যদল।"

রোমান্ ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট, প্রেস্‌বাইটারিয়ান্, কানাডিয়ান্ মিশন, সেভেন দে এ্যাড্‌ভেন্‌টিস্ট, যেহোবা উইট্‌নেস্, পেণ্টাকণ্ট্‌—এই সকল দল ও উপদলের ভিতরে কাহারো সাথে কাহারো মিল নাই। ব্রিক্সটন্ এলাকায় অনুষ্ঠিত দাঙ্গা মূলতঃ সাদা খৃষ্টান ও কালো খৃষ্টানদের ভিতরে। এই দলাদলি ভারতের বিভিন্ন চার্চ্চেও আছে।

ইংরাজ আমলে ভারতের গীর্জ্জাগুলিতে বর্ণকৌলিন্যের বিষয়টি খুবই সযত্নে রক্ষা করা হইত। কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয় খৃষ্টানরা কখনোই শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টানদের সঙ্গে একাসনে বসিতে পারিত না। গীর্জ্জাগুলিতে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ খৃষ্টানদের জন্য থাকিত স্বতন্ত্র আসনের বন্দোবস্ত। স্কুলে ও কলেজ হোস্টেলগুলিতেও সাদা ও কালো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা। বস্তুতঃ, মিশনারীরা ভারতের কালা আদমিদের সাম্য ও সুবিচারের প্রলোভন দেখাইয়া অবশেষে তাহাদিগকে Exploit করিয়াছেন মাত্র।

দক্ষিণ আমেরিকার কৃষ্ণকায় নিগ্রো খৃষ্টানদের প্রতি সেই দেশের বর্ণকুলীন শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টানদের অমানবিক ব্যবহারের বিষয় আমরা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। তাহাদের উপর যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করা হইত। আমরা দেখিয়াছি, সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহার্য্য রেস্তোরাঁ-হোটেল, সরকারী স্কুল-কলেজ, পার্ক-ময়দান, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদিতে নিগ্রো খৃষ্টানদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এমন কি শ্বেতাঙ্গ পল্লী হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে আলাদা করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সব কি সাম্যের লক্ষণ ? না, সুবিচারের লক্ষণ ? আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 'নাগরিক অধিকার বিল' পাশ্ করিতে যাইয়া প্রেসিডেণ্ট কেনেডি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। দক্ষিণ

আফ্রিকাতেও কৃষ্ণাঙ্গেরা শ্বেতাঙ্গদের শাসন ও শোষণের শিকার হইয়া আছেন।

## বিভেদ—মুসলিম ধর্ম্মে ও সমাজে

আশ্চর্য্য হইবেন না—ভেদ-বৈষম্য, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ মুসলিম ধর্ম্মে ও মুসলিম সমাজেও পুরোপুরি আছে। শ্রদ্ধেয় মৌলানা সৈয়দ আবদুর রউফ-প্রণীত 'ইসলামী আকায়েদ বা জ্ঞানের আলো', অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের লেখা বই এবং আরো বিবিধ বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের হাতে যে তথ্যাবলী আছে, তাহার ভিত্তিতেই বর্ত্তমান আলোচনায় কিছু বলিব।

ইসলামের ভিতরে আছে তিনটি জামাত বা সম্প্রদায়—সুন্নী, শিয়া এবং হাদিশ। সুন্নী তাঁহারাই যাঁহারা কোরাণ, হাদিশ, এজমা ও কেয়াস এই চারিটি ঐশ্লামিক শাস্ত্রকেই মান্যতা দেন। শিয়ারা সকলের উপর মান্যতা দেন হজরত আলীর (হজরত মহম্মদের জামাতা) মতামতকে। হাদিশ সম্প্রদায় কোরাণ মানেন, হাদিশ মানেন, কিন্তু এজমা ও কেয়াস মানেন না।

আবার আছে তিনটি 'কৌম'—আশরাফ, আতরাফ এবং আরজাল। ইহার ভিতরে আশরাফেরা হইলেন পরম কুলীন। ওঁরা কোন নবী বা আলীর বংশধর। ওঁরাই সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত, সভ্য, উন্নত ও অভিজাত বলিয়া দাবী করেন। আতরাফেরা উচ্চ সভ্য নহে, অর্দ্ধসভ্য। কোনও নবী বা আলীর বংশধর কিনা তাহাও জানা যায় না। আর আরজালেরা মুসলমান বটে, কিন্তু অসভ্য, বর্ব্বর। অর্থাৎ, ওরা একপ্রকার আগাছা—মুসলমান হইয়াও ব্রাত্য এবং উচ্চ সমাজে অপাংক্তেয়। আশরাফেরা ব্যতীত কেহ সৈয়দ বলিয়া দাবী করিতে পারে না, করিলে তাহা গ্রাহ্য নহে এবং পরকাল ঝরঝরে। আবার তিয়াত্তরটি ফেরকা বা দলের কথাও বলা হয়। তাহার ভিতরে বেহেস্তে

যাইবেন মাত্র তাঁহারাই যাঁহারা জান্নি বা জান্নাতি ফেরকার অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট বাহাত্তর ফেরকাই যাইবে দোজখে বা নরকে।

সুন্নী ও শিয়ার লড়াই তুঙ্গে। উভয়ের মসজিদ পৃথক্, পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ চলে না এবং রক্তারক্তি বিরোধ হামেশাই হয়। হিন্দুর বর্ণাশ্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রসঙ্গ আছে। তেমনি মুসলমান সমাজেও আছে সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান, মল্লিক প্রভৃতির ভেদ। ইঁহাদের ভিতরে সৈয়দেরা মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণতুল্য।

আমরা প্রামাণিক সূত্রে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি—এই গোষ্ঠী-চেতনা মুসলিম দেশের সর্ব্বত্র। যেমন ধরুন, তৈলসমৃদ্ধ ধনীর দেশ কুবাইতের কথা। তথায় আল্‌সাক্‌র ( Al-Saqr ), আল্ ঘানিম ( Al-Ghanim ), আল্ খোরাফি ( Al-Khorafi ), আল্ হামাদ্ ( Al-Hamad ), আল্ মোতাওয়া ( Al-Motaova ), আল্ হাজিমি ( Al–Hazimi ), আল্ মোতেয়িরি ( Al-Mutairi )—এই সব গোষ্ঠী হইলেন উচ্চ অভিজাত বংশীয়, আর আল্ জাহের (Al-Żaher), আল্ দাইহানি ( Al-Daihani ), আল্ শাইবানি (Al-Shaibani), আল্ আজ্‌মি (Al-Azmi), আল্ মাতুক্ ( Al-Matok ) প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি হইল অবর শ্রেণীর অনভিজাতসম্ভূত। ইহাদের ভিতরে সামাজিক সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। প্রথম অভিজাত গোষ্ঠীর মানুষ দ্বিতীয় অনভিজাত গোষ্ঠীর মানুষের ঘরে স্বেচ্ছায় কখনো কন্যা দান করিবে না। অভিজাত ও অনভিজাতের ভিতরে এই সামাজিক প্রভেদ বেশ জোরালো ভাবেই বিদ্যমান। এই প্রভেদ অতি পরিষ্কার। ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এক ইরাকী বন্ধুর উক্তি, তাঁহারাও বংশমর্য্যাদার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেন—বিবাহাদি বা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে। সৌদী আরব, পাকিস্থান সর্ব্বত্র এই চিত্র দেখিবেন। বস্তুতঃ, ইসলামও এই উচ্চাবচের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের কথা এক, আর সামাজিক ব্যবহার অন্যরূপ।

ভারতের ইতিহাসের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টি দিন। সুন্নী মোগল সম্রাটগণ শিয়াদের উপর হামলা ও অত্যাচার করিতে দ্বিধা করিতেন না। সুন্নী সম্রাট শাজাহান দক্ষিণ বিজয়ে ( ১৬৩৫-৩৬ খৃঃ ) গিয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত দুই সুলতানের রাজ্যের উপর 'খরজ' দাবী করেন। যে সকল জমির মালিক অমুসলমান তারাই মাত্র 'খরজ' দিতে বাধ্য থাকেন। শাজাহান শিয়াদের রাজ্যকে অমুসলমান রাজ্য বলিয়া গণ্য করিতেন। আওরঙ্গজেবের আমলে কট্টর সুন্নী আমীর সৈয়াদৎখান শিয়া আমীর রহুল্লাখানের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই ( Some Aspects of Social Life During the Mughul Age—Dr. P. N. Chopra P. 20). আওরঙ্গজেব শিয়াদের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান মহরমের মিছিল নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালেও মহরমের সময় সিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্ব সরকারী প্রশাসনকে চিন্তিত করে। শিয়াদের মহরমের মিছিল সুন্নীদের মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইতে পারে না। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিয়াদিগকে আদালতে আইনের সাহায্য লইতে হইয়াছে—সংবিধানের ২২৬ ধারা বলে।

ইতিহাস আরো বলে, বহিরাগত মুসলমানগণ অর্থাৎ তুর্কীগণ ভারতীয় মুসলমানদের সাচ্চা মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তৈমুরলং তুঘলক সুলতানদের 'কাফের' বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। সুলতানী যুগে ভারতীয় মুসলমানরা সেনাবিভাগে পদাতিকের কার্য্য করিত, অশ্বারোহণের অধিকার তাহাদের ছিল না। মনস্বী ইংরাজ লেখক M. T. Titus তাঁহার 'Islam in India & Pakisthan গ্রন্থে ইসলামী সমাজে ভেদের কথা বলিয়াছেন (P. 176)। তাঁহার মতেও আশরাফ ও আরজালদের ভিতরে দুস্তর ব্যবধান। মধ্যযুগীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ভারতীয় মুসলমান সমাজে উচ্চনীচ ভেদ

প্রকট ছিল। আলিম, সৈয়দ, পীররা ছিলেন সমাজের শীর্ষে। তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার সাধারণ মুসলমানের ছিল না। জোলা ( বস্ত্রবয়ন শিল্পী ), গোলা, কাবাদি ( মৎস্য ব্যবসায়ী ), হাজাম (লিঙ্গচর্ম্মাগ্রচ্ছেদক নাপিত) প্রভৃতিরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। ইহাদিগকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হইত। আজিও তাহারা সেই অবস্থাতেই আছে। ইহারা বস্তুতঃ আরজাল মুসলমান। এই আরজালদের ভিতরেই আবার কত ভাগ। এক বিবরণে প্রকাশ, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের মুসলমানরা অন্ততঃ ৭৯টি উপজাতিতে বিভক্ত। তাহাদের পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ মানুষকে লজ্জা দেয়।

শুধু ভারত কেন ? পুনশ্চ বলি, খোদ সৌদি আরবে যান, সেখানেও মুসলিম বর্ণকৌলিন্য দেখিবেন। বাদামী রঙের আরবীয়েরাই আদি ও অকৃত্রিম। কৃষ্ণকায় মুসলমানরা বাদামীদের পূর্ব্বপুরুষের গোলাম বা ক্রীতদাস। দুই রঙে অনেক প্রভেদ। একই মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াও শিয়াদের ন্যায় খোজা, সুফী, আহমদীয়া ও বাহাইরা মতবাদে স্বতন্ত্র। আহমদীয়ারা রোজা, নামাজ, কোরাণ মানিয়াও পাকিস্থানে উৎপীড়িত সংখ্যালঘু। বাহাইদিগকে পিটাইয়া তাড়ানো হইয়াছে খোমেইনির ইরাণ রাজ্য হইতে। ইহার পর আছে এক মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য মুসলমান রাষ্ট্রের শোণিতাক্ত যুদ্ধ। সুতরাং, কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি সমাজক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে—ইসলামে ভেদ ও সংঘর্ষের কথা অস্বীকার করিবে কে ? আর বিভেদ যখন সর্ব্বত্রই তখন কেবল হিন্দু হরিজনদের জন্য প্রিয় বন্ধুদের এত কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন কেন ? কাহার স্বার্থে ? কি মতলবে ?

মীনাক্ষীপুরমের ৬০০ শত হরিজনকে বড় ঘটা করিয়া কল্‌মা পড়ানো হইয়াছিল। নগদ টাকার বেসাতি তো ছিলই, আর ছিল অত্যুৎসাহের বাঁধভাঙ্গা বন্যা। তিনকাশী, কাদয়ানালুর প্রভৃতি গ্রাম

হইতে কম করিয়াও চার হাজার মুসলিম সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন এই ধর্ম্মান্তর মহোৎসবে। সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন লীগপন্থী বিধায়ক শ্রী সাহুল হামিদ, উপস্থিত ছিলেন বহু মুসলিম ধর্ম্মীয় নেতা। উল্লাসে যেন ফাটিয়া পড়েন সকলে। পরম শিবম্ নামে এক হরিজনকে তো তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ধর্ম্মান্তরিত করা হয়। তিন ঘর খৃষ্টানও রেহাই পায় নাই। উপস্থিত মুসলিম রমণীরা ঘরে ঘরে যাইয়া অনিচ্ছুক হরিজন মহিলাদিগকে ময়দানে টানিয়া আনেন। ধর্ম্মান্তর কর্ম্মের পর সধবাদিগের সতীত্বের চিহ্ন 'মঙ্গলসূত্রম্' ছিঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং বিবাহিতাদের আবার বিবাহ দেওয়া হয় ইস্‌লামের মতে। হিন্দুমতের বিবাহটা নাকি বিবাহই নয়।

এখানেই শেষ নয়। ৫৯ জন নাবালক বালকের লিঙ্গছেদ করিয়া দেওয়া হয়। ধর্ম্মান্তরিতেরা প্রত্যেকেই ভূষিত হয় লুঙ্গি, ফেজ, টুপিতে, আর নূতন মুসলিম নামে। মসজিদের ভিত্তিও স্থাপিত হইয়া যায়। আর মীনাক্ষীপুরম্ গ্রামের নাম পাল্‌টাইয়া নূতন নামকরণ করা হয় রহমত নগর। খুব খানাপিনা হইয়াছিল। এমনও শুনা যায়, নব-দীক্ষিতদের পাতের উচ্ছিষ্ট কাড়িয়া কাড়িয়া খাওয়া হইয়াছিল—ইসলামে কত সাম্য তাহার প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য। অর্থাৎ, হরিজনদের জাত মারার কর্ম্মটি খুব দক্ষতার সঙ্গেই করা হয়।

এক্ষণে বিনীত প্রশ্ন—এই নবদীক্ষিত হরিজনদের মুসলিম সমাজে স্থান হইবে কোথায়? কি পদ্ধতিতে তাহাদের মর্য্যাদার মান নির্দ্ধারিত হইবে? তাহারা কোন্ কৌমের অন্তর্ভুক্তি লাভ করিবে? আশরাফ? আতরাফ? না, আরজাল? নিকাহের জন্য সৈয়দের ঘরের কন্যা পাইবে কি তাহারা? অথবা, সৈয়দেরা ওদের ঘরের মেয়ে লইবেন কি? ওরা কোন্ ফেরকায় গণ্য হইবে? জান্নি বা জান্নাতি ফেরকায় স্বীকৃতি পাইবে কি? জান্নাতি না হইলে তো বেহেস্তার দরজা বন্ধ।

বেচারীরা ছিল হিন্দু হরিজন। জাতি-কুল-ধর্ম্ম খোয়াইয়া এখন হইল কি মুসলিম হরিজন? আখেরে লাভ হইল কি এবং কতটা?

# হিন্দুধর্ম্মের প্রচারশীলতা ও আমাদের কর্ত্তব্য

প্রচারশীলতা যে অন্য ধর্ম্মের নিকটই আমাদিগকে নুতন করিয়া শিখিতে হইবে তাহা নয়। অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, হিন্দুধর্ম চিরকালই প্রচারশীল ছিল, এমন কি অন্য ধর্মের চেয়েও বেশী প্রচারশীল। পঞ্চনদের তীরে প্রথম যে আর্য্য সভ্যতার বিকাশ হয়, পরবর্ত্তীকালে তাহা সমগ্র ভারতে এবং বহির্ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এ দেশের অনার্য্যাখ্যাত বহু জাতি ও উপজাতি ক্রমে ক্রমে আর্য্যধর্ম ও আর্য্যসংস্কৃতির ছত্র-ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আর্য্য সমাজের সহিত সর্ব্বতোপ্রকারে একীভূত হইয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে আর্য্যসভ্যতা ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র ১৮টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্দেশ্য কেবল রাজনৈতিক দিগ্বিজয় নহে, সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যধর্ম ও আর্য্যসংস্কৃতির প্রচার-প্রসারও উহাদের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেকটি অশ্বমেধ যজ্ঞে সুগ্রীবাশ্রিত বানরগণ এবং বিভীষণাশ্রিত রাক্ষসগণ যোগদান করিত। শ্রীরামচন্দ্রের ভাগবত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এবং ক্রমাগত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে যোগদান ও অংশগ্রহণের ফলে তাহারা ধীরে ধীরে শান্ত, বিনয়ী, সদাচারপরায়ণ ও আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং আর্য্যগণ সর্ব্ববিধ ধার্মিক ও সামাজিক অধিকার দিয়া পুরোপুরি তাহাদিগকে আর্য্য করিয়া নিয়াছিলেন। বানরগণ কর্ত্তৃক পরিবেশিত ভোজ্য ব্রাহ্মণগণ সানন্দে ভোজন করিতেছেন—বাল্মীকি-রামায়ণে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বে শরভঙ্গ, অত্রি, অগস্ত্য

প্রভৃতি ঋষিরা দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে আর্য্যধর্মের প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে পাড়ি দেন এবং ভারতীয় দ্বীপগুলিতে আর্য্যধর্ম প্রচার করেন। অগস্ত্য কর্ত্তৃক গণ্ডূষে সমুদ্রপানের রূপক কাহিনীর মধ্যে সেই দিগ্বিজয়ের ইতিহাসটিই লুক্কায়িত আছে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল—ধর্ম-সংস্থাপন। ইহা গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখের বাণী। কি ভাবে এ ধর্ম সংস্থাপনের কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন সেই ইতিহাস মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করা কঠিন কাজ নয়। এখানে সে আলোচনার অবসর আমাদের নাই। তবে সংক্ষেপে আমরা এই বলিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণের সময় আর্যধর্ম, আর্য্যসংস্কৃতি এবং আর্য্য জাতীয়তার সমধিক বিস্তৃতি লাভ ঘটিয়াছিল।

ঐতিহাসিক যুগে শক, হূণ, গুর্জর, প্রতিহার প্রভৃতি অন্যান্য জাতি আক্রমণকারীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অবশেষে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়; পরে তাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া যায়। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ স্থান ব্যাপী বৌদ্ধধর্মের যে প্রচার-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, উহাতে হিন্দুরও গৌরব করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। কেন না, সকলে স্বীকার করুন বা না করুন, বৌদ্ধধর্ম বিশাল হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা বিশেষ। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। স্বয়ং তিনি মণ্ডলীসহ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং ভারতের ৪টি স্থানে চারিটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে দশটি সম্প্রদায়ে বিভাগপূর্বক বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে বিশেষ বিশেষ শাখা-সম্প্রদায়কে নিয়োগ করিয়া সুপরিকল্পিত উপায়ে সমগ্র ভারতব্যাপী ব্রাহ্মণ্যধর্মের

পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া যান। অবিশ্রান্ত প্রচারই যে সন্ন্যাসীর অন্যতম প্রধান বৃত্তি, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মঠানুশাসনে উহারই উপর জোর দিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব সমগ্র বাংলা উড়িষ্যা ও আসামের এক বৃহৎ অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখানেও আমরা প্রচারশীলতার পরিচয় পাই। বিরাট মণ্ডলীসহ তিনি হরিনাম প্রচার করিতেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রাঙ্মুহূর্তে বাংলা দেশ বৌদ্ধপ্লাবিত ছিল। বৌদ্ধদের অহিংস নীতির সুযোগ নিয়া মুসলমান-গণ তাহাদের উপর যথেচ্ছ পীড়ন চালাইতেছিল এবং তাহাদিগকে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিতেছিল। স্মার্ত্ত হিন্দুরাও এই আক্রমণ হইতে রেহাই পায় নাই। ফলে এইরূপ আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল যে, বাংলা হইতে হিন্দুত্বের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বুঝি লুপ্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু সেই সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংস হইতে বাঙ্গালী হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমধর্মের সার্বভৌম আদর্শ উচ্চনীচ, পতিত, দলিত সকলকে আশ্রয় দিয়াছিল। সমাজচ্যুত সুবুদ্ধি রায়, এমন কি যবন হরিদাস পর্য্যন্ত সেই আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হন নাই। শুধু বাংলাদেশ নহে, কালক্রমে আসামের বহু উপজাতি চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল।

ভারতের বুকে যুগে যুগে বহু সাধক, আচার্য্য, মহাপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রবর্তক আবির্ভূত হইয়াছেন। স্বীয় স্বীয় মত প্রচারে কাহারোই উদ্যম ন্যূন ছিল না। শুধু ভারতে নহে, ভারতের বাহিরে পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে এক কালে হিন্দুধর্মের প্রচার-প্রসার হইয়াছিল। বর্তমান যুগের চিন্তাশীল মনীষী ও গবেষকবৃন্দ মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আধুনিক যুগেও আর্য্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আর্য্য-হিন্দুধর্মের সেই সনাতন প্রচারশীলতার ঐতিহ্য বহন করিতেছেন। এই সব খবর অনেকেই রাখেন না, তাই সমালোচকগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া মন্তব্য করিয়া বসেন যে, হিন্দুধর্ম কোনো দিনই প্রচারশীল ছিল না। এই ভ্রান্তি অচিরে হিন্দুকে পরিহার করিতে হইবে এবং অতীতের ইতিহাস হইতে প্রেরণা লইয়া দিগ্বিদিকে আত্মপ্রসারের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। আর্য্যহিন্দুর জাতীয় সঙ্কল্প—"কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্।" বৈদিক ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রত্যেক হিন্দু আজ এই মহাসঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক!

## চাই—সর্ব্বত্র আত্মরক্ষার দুর্গ স্থাপন

ধর্মের জন্যই এদেশের উপজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির লোকেরা ধর্মান্তর গ্রহণ করে না। নিজেদের সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থার উন্নতির জন্যই তাহারা পরধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। এ অবস্থায় শুধু মাত্র অন্য সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্যের সমালোচনা করিলেই হিন্দুর সংখ্যাহ্রাস বন্ধ হইবে না। তথাকথিত উপজাতি ও অনুন্নত হিন্দুগণ যে সব অভাব, অভিযোগ ও অবিচারের তাড়নায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সেই সব অভাব, অভিযোগ ও অবিচারের প্রতিকার যাহাতে হিন্দু-সমাজ হইতেই হয়, তেমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। কোন প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি নিয়া নয়, পরন্তু হিন্দুর আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের তাগিদেই।

আজ দরকার—কেন্দ্রে কেন্দ্রে আত্মরক্ষা ও আত্মসংগঠের দুর্গ গড়িয়া তোলা এবং ঐ সব কেন্দ্রগুলিকে এক মূল কেন্দ্রের সহিত যুক্ত

করিয়া নেওয়া এবং এই উপায়ে বিরাট হিন্দুজনতাকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া তোলা। ঐ কেন্দ্রগুলির কার্য্য হইবে। (১) হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ; (২) হিন্দুর ব্রত, পার্বণ, যাগযজ্ঞ, ভজন, উপাসনা, মহোৎসব, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির নিয়মিত অনুষ্ঠান ; (৩) হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতিমূলক পুস্তিকাদি প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রচারণা ; (৪) হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি, সাধনা, আদর্শ ও জাতীয়তা সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা উঠিলে উহার সমুচিত জবাব দানের ব্যবস্থা ; (৫) অনুন্নত ও পার্বত্য হিন্দুগণের নিয়মিত খোঁজ খবর রাখা এবং তাহারা যাহাতে হিন্দুসমাজের নিকট সর্ববিষয়ে সুবিচার ও সদ্ব্যবহার পায় তাহার ব্যবস্থা করা এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, সদাচার, নৈতিক আদর্শ ও হিন্দুয়ানী প্রচার ; (৬) যদি কোনো হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্কল্প করে তবে তৎক্ষণাৎ উহার কারণ অনুসন্ধান এবং তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করার সময়োপযোগী চেষ্টা ; (৭) কোনো ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হয় তবে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং শুদ্ধি করিয়া তাহাকে সসম্মানে সমাজে গ্রহণ ; (৮) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বালক ও বালিকাগণকে হিন্দুয়ানী শিক্ষা দান ; (৯) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে হিন্দু-সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তারূপ মহাপাপের মূলোচ্ছেদ, যাহাতে অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিরা হিন্দু-সমাজের ছিদ্রান্বেষণ পূর্বক সর্বনাশ সাধন করিতে না পারে ; (১০) ধর্মপ্রচারের সহিত সেবাবিভাগ খুলিয়া দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগণকে ক্ষেত্র ও পাত্রানুরূপ সাহায্য দান, যাহাতে স্বাধীন দেশের নাগরিকগণকে বিদেশী বন্ধুদের দ্বারে হাত পাতিতে না হয় ; (১১) নিরাশ্রয়া বিধবা ও অসহায় শিশুদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, যাহাতে বিধর্মীর কবলে গিয়া না পড়ে ; (১২) সুশিক্ষিত প্রচারক ও কর্মিদল গঠনের জন্য স্থানে স্থানে হিন্দু শিক্ষায়তন স্থাপন ও পরিচালন।

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। আমরাও স্বাধীন দেশের নাগরিক। সত্যিকারের স্বাধীনতার চেতনা যদি আমাদের মনে প্রাণে জাগ্রত হয়, তবে এ কাজ কেন আমরা করিতে পারিব না? বৎসরে গড়ে মাথা পিছু একটি করিয়া টাকা কি আমরা স্বধর্ম, স্বসমাজ ও স্ব-সংস্কৃতির সংরক্ষণে ও সম্প্রসারণে ব্যয় করিতে পারি না? ৪০ কোটী হিন্দু যদি গড়ে বৎসরে মাথাপিছু একটি করিয়া টাকাও এতদুদ্দেশ্যে ব্যয় করেন, তবে বৎসরে হয় ৪০ কোটী টাকা। অর্থাৎ, এই সামান্য ত্যাগটুকু স্বীকার করিতে প্রত্যেক হিন্দু যদি আজ আগাইয়া আসেন, তবে ইহার দ্বারাই বর্তমান অবস্থায় আমরা চতুর্গুণ কার্য্য দেখাইতে পারি।

**হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল আন্দোলন**

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল আন্দোলনই হিন্দুর আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গ। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত উপায়ে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতি, হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার এবং এতদুপায়ে হিন্দু জনতার ভিতর স্বধর্ম ও স্বসংস্কৃতির চেতনার সঞ্চার; হিন্দুর ধর্মান্তর গ্রহণ প্রতিরোধ ও ধর্মান্তরিতগণকে শুদ্ধি অন্তে সমাজে উপযুক্ত স্থান দান; আদিবাসী সংগঠন ও অসহায় নারী ও শিশুর রক্ষা; অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার মূলোচ্ছেদ; নিঃস্ব, আর্ত্ত ও দরিদ্র জনগণের যথাসাধ্য সেবা; হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তার আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাবিস্তার; পল্লী-উন্নয়ন, স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং সমগ্র হিন্দু নরনারীর বাহুতে ও মনে আত্ম-রক্ষার বীর্য্য সঞ্চার। পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে এই আন্দোলনের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হইয়া নিয়মিত কার্য্য চলিতেছে। সেই সব স্থানে উহার সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দুজনতার মধ্যে স্বধর্ম্ম ও স্বসংস্কৃতির চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের যাবতীয় সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। পরস্পরের

মধ্যে ঐক্য, সখ্য ও সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উক্ত সংগঠন-শক্তিবলে হিন্দুর ধার্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা সমূহের সমাধানের পথ প্রশস্ততর হইতেছে এবং হিন্দু-সমাজের উপর আগত যে কোনো ক্ষয়, ক্ষতি, আঘাত, আক্রমণের প্রতিবিধান হইতেছে। এস হিন্দু, অগ্রসর হও! স্বীয় স্বীয় পল্লীতে এই আন্দোলনের শাখা স্থাপন করিয়া সংঘের প্রধান কার্য্যালয়ের সহিত যুক্ত করিয়া নিয়া স্বধর্ম, স্বসংস্কৃতি ও স্বজাতি রক্ষার সুব্যবস্থা কর।

শুধু স্বীয় স্বীয় পল্লীতে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেই কর্ত্তব্য সমাধা হইবে না; সংঘের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠে সেদিকেও মনোযোগ দিতে হইবে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ যে বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে যেমন তার চাই সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ও ত্যাগব্রতী কর্ম্মী, তেমনি চাই তার কেন্দ্রীয় ধন-ভাণ্ডারে কোটি কোটি টাকা। আমরা দেশের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণকে অর্থবিত্তসহ সংঘের পশ্চাতে দাঁড়াইতে এবং দেশের কর্ম্মী যুবকগণকে এই মহান্ ব্রত সাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে আহ্বান জানাইতেছি।

## শেষ কথা

**'বর্ত্তমান'** পত্রিকা, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ তারিখের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, মুর্শিদাবাদে আদিবাসীদের লোভ দেখাইয়া খৃষ্টান করা হইতেছে। নবগ্রাম, সাগরদীঘি, হাতিনগর, ধরক্ষ নগরে ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি নূতন গীর্জ্জা তৈরী হইয়া গিয়াছে। প্রথমে কয়েক মাস সয়াবীনের তেল, গম ও গুঁড়ো দুধ বিতরণ করা হয়।

বেশ কয়েক মসে পর সেই নির্দ্দিষ্ট এলাকার নেতা গোছের মানুষটিকে তাহারা বন্ধু করিয়া লয়। তাহার পর শুরু হয় মগজ ধোলাই। স্বাধীন ভারতে তাহারা কি পাইল? চার্চ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং, বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকিলে তাহাদের উচিত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা। গ্রামের বা এলাকার নেতা যখন ধর্ম্মান্তরিত হন তখন চার্চের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মাহিনা দেওয়া হয়। 'বর্ত্তমান' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের সমীক্ষায় প্রকাশ, এই কাজের সাফল্যের উপর মাহিনারও রকম-ফের আছে। মোটামুটি ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা।

তাহা হইলেই দেখুন, 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্'। পরাধীন ভারতে মিশনারীরা যে ভাবে মানুষকে **exploit** করিত, স্বাধীন ভারতেও সেই **exploitation** সমানে চলিতেছে। ভারতে অন্য ধর্ম্মের প্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুর দ্রুত সংখ্যাহ্রাস ঘটিতেছে। এই সকলই আমরা প্রামাণ্য তথ্যাদি সহায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি এবং প্রতিকারোপায়ও বিবৃত করিয়াছি। হিন্দুগণ যদি সময়োচিত কর্তব্য পালনে তৎপর না হয়, তবে তাহার পরিণাম হইবে বড় দুঃখপ্রদ। খণ্ড খণ্ড ভাবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু প্রচেষ্টা চলিলেও বর্তমানে সমষ্টিগত ভাবে হিন্দুজনতা স্বধর্ম্ম ও স্বসংস্কৃতি প্রচারে যে ভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছে, পক্ষান্তরে অন্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের তীব্রতা যে ভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এই আশঙ্কা অমূলক নয়। হিন্দু এখনো যদি উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে, তবে হিন্দুধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে থাকিবে

এবং অহিন্দু ধর্মের প্রভাব ক্রমবর্ধমান হইয়া চলিবে। ইহার পরিণাম —ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুর ক্রমঃ সংখ্যাহ্রাস এবং সম্প্রদায়বিশেষের ক্রমঃ সংখ্যাবৃদ্ধি। আর এই ক্ষয় ও বৃদ্ধির ফলে এমন একদিন আসিবে যখন পুনরায় দেশকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াও হিন্দু অব্যাহতি পাইবে না ; সম্প্রদায় বিশেষের হস্তে সমগ্র ভারত খণ্ডকেই তুলিয়া দিয়া তাহাদেরই দাসত্ব বরণপূর্ব্বক অথবা তাহাদেরই মধ্যে নিঃশেষে আত্মবিলোপ করিয়া দিয়া হিন্দুকে আজিকার নিষ্ক্রিয়তা, ঔদাসীন্য, ভ্রান্তি ও পাপের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইতে হইবে। তাই সর্ব্বশেষে আবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করি—হিন্দু, হুঁসিয়ার !

# শাস্ত্রীয় পর্য্যায়ের গ্রন্থাবলী

- **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ( গুরুমুখী ভাষ্য ) :**— গীতার ভাষ্যজগতে নূতন অবদান। ভাষ্যকার স্বামী বেদানন্দ।

- **শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা :**—সরল, সহজ ও সাবলীল ভাষায় সন্ন্যাসী সাধকের তত্ত্ববিশ্লেষণ। স্বামী অদ্বৈতানন্দজী কর্তৃক সম্পাদিত।

- **শ্রীশ্রীগুরুগীতা :**—মূল শ্লোক, অন্বয়, সরল বঙ্গানুবাদ ও শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বপ্রদীপিকা শীর্ষক স্বামী নির্ম্মলানন্দজীর সুষম ব্যাখ্যা।

- **শ্রীশ্রীঈশ্বরগীতা :**—এই শৈবগীতা বঙ্গভাষায় ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নি। ৪১৬টি শ্লোকের সরল বঙ্গানুবাদ এবং প্রতিটি অধ্যায়ের সারতত্ত্ব। সম্পাদনায় স্বামী নির্ম্মলানন্দ।

- **দেবদেবী ও তাঁদের বাহন :**—হিন্দুর উপাস্য মুখ্য দেব ও দেবীদের শাস্ত্রসম্মত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য বিশ্লেষণ। **দুই দেবী এবং বারো মাসে তেরো পার্বণ—কি ও কেন?** গ্রন্থদ্বয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী নির্ম্মলানন্দ-প্রণীত।

- **এই পর্য্যায়ের আরো বই :**—গুরুমুখী রামায়ণ, গুরুমুখী মহাভারত, ছাত্রদের রামায়ণ, শিশুদের রামায়ণ, শিশুদের মহাভারত, হিন্দুত্বম্, হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব, হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য, গঙ্গামাহাত্ম্য ও গঙ্গাসাগর তীর্থের কথা, শ্রীশ্রীগয়ামাহাত্ম্য ও গয়াকৃত্য, ভারতে কুম্ভমেলা, ত্রিশূলতত্ত্ব ও ত্রিশূলোৎসব।

**চরিতগ্রন্থাবলী :**—মহাপুরুষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, বিদগ্ধ সাধক স্বামী বেদানন্দ ও তাঁর সাহিত্যকর্ম, সংঘসাধক-চরিতমালা—প্রতি গ্রন্থে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের লীলাপার্ষদগণের পূত জীবনপ্রসঙ্গ।

# ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিগঠনমূলক গ্রন্থাবলী

ব্রহ্মচর্য্যম্ ( প্রতি যুবকের অবশ্য পাঠ্য ), গার্হস্থ্যম্ ( গার্হস্থ্য ধর্মের দিগ্‌দর্শন ), হিন্দুনারীর আদর্শ ও সাধনা ( কুমারী, সধবা, বিধবা সকলের পাঠ্য ), জীবনসাধনার পথে, পাথেয়, সাধনবাণী ( বাস্তব উপদেশাবলী ), শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু, শ্রীশ্রী-জগদ্‌গুরু ( গুরুতত্ত্ব ও গুরুপূজাবিধি ), হিন্দুসমাজ-সমন্বয় আন্দোলন, চেতনার ডাকে হিন্দু, হিন্দু হুঁসিয়ার, হিন্দুসংগঠন-মন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ, আদর্শ বিদ্যার্থী, শিক্ষা-সমস্যার সমাধান কোন্ পথে ?, Ideals of Indian Education and Culture, মহাভারতে বিদ্রোহ ( নাটক ), বঙ্গবীরাঙ্গনা ( নাটক ), সঙ্ঘবাণী, যুগধর্ম্ম, ধ্রুব ভারত, Foundation of Religion, প্রচারব্রতে বিশ্বময় ( যন্ত্রস্থ ), পণপ্রথা সমাজের কলঙ্ক।

কবিতা ও গান :—সঙ্ঘসঙ্গীত-চয়নিকা, ঐ স্বরলিপি, প্রতিজ্ঞা, অঞ্জলি, সঙ্ঘবিষাণ, হিন্দুবোধন।

**প্রণব** :—সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্র। ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি ও জাতীয়তামূলক রচনায় সমৃদ্ধ। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ।

---

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে (২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯) প্রাপ্তব্য ও মূল্যাদি জ্ঞাতব্য।